দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আমার রমাদান

আপণ সাথী আল- কুর'আন

কুর'আন মাজীদঃ ৯ম পারা

Sisters' Forum In Islam.com

কুর'আন মাজীদঃ ৯ম পারা

মোট রুকুঃ ১৭রুকু

সূরা সমূহঃ আরাফঃ(১১-২৪) রুকু

আনফালঃ(১-৪) রুকু

সুরা আরাফঃ ১১তম রুকুর (৮৮-৯৩) আয়াত

১। শুয়াইব আ এর জাতির প্রধানগণের দাম্ভিকতা ও আত্মগরিমার কথা বুঝা যায় এর মাধ্যমে, তারা শুধু তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াতকে অস্বীকারই করেনি; বরং তার থেকেও সীমা অতিক্রম করে আল্লাহর নবী ও তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে হুমকি দিয়ে বলেছিল যে, 'তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে এস, নচেৎ আমরা তোমাদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেব।'

২। শুয়াইব আ বলেছিলেন- যদি আমরা পুনর্বার পূর্ব ধর্মে ফিরে যাই, যার থেকে আল্লাহ আমাদের পরিত্রাণ দিয়েছেন, তাহলে এর অর্থ হবে আমরা ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছিলাম। যার অর্থ হল, আমরা এ রকম করব, তা কখনই সম্ভব নয়।তারা নিজেদের সংকল্প প্রকাশ করার পর ব্যাপারটি আল্লাহকে সোপর্দ করে দিল।

رَبُّنَا كُلَّ شَىۡءٍ عِلۡمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلۡنَا ؕ رَبَّنَا افۡتَحۡ بَيۡنَنَا وَ بَيۡنَ قَوۡمِنَا بِالۡحَـقِّ وَ اَنۡتَ خَيۡرُ الۡفٰتِحِيۡنَ

সবকিছুই আমাদের রবের জ্ঞানের সীমায় রয়েছে, আমরা আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে ফয়সালা করে দিন এবং আপনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী। আয়াতঃ৮৯

৩। নেতারা সাধারন ইমানদারদের বলেছিলো-তোমরা যদি শু'আইবকে অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

৪। ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে (মরে) রইল। এখানে) رَجۡفَة ভূমিকম্প) শব্দ ব্যবহার হয়েছে আর সূরা হূদের ৯৪ আয়াতে صَيۡحَة চিৎকার শব্দ এবং সূরা শুআরার ১৮৯ আয়াতে ظُلَّة মেঘের ছায়া শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, আযাবে সকল জিনিসই একত্রিত হয়েছিল। অর্থাৎ, প্রথমে মেঘ তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছিল, যাতে আগুনের শিখা ও অঙ্গার ছিল। তারপর আকাশ হতে এক বিকট শব্দ ও মাটি হতে ভূমিকম্প শুরু হয়; যার ফলে তারা মারা যায় এবং তাদের লাশগুলি পাখীর ন্যায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে।

৫। ক্ষতিগ্রস্ত তারাই হল যারা নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, নবী (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ নন। আর ক্ষতি ইহকালের ও পরকালেরও।

৬। আযাব ও ধ্বংসের পর যখন শুয়াইব আ সেখান থেকে বিদায় হলেন তখন আবেগাপ্লুত হয়ে এ কথাগুলি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমার রবের রিসালাত (প্রাপ্ত বাণী) আমি তো তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। সুতরাং আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আক্ষেপ করি!

Sisters'Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ১২তম রুকুর (৯৪-৯৯) আয়াত

১। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় রীতি অনুযায়ী যে জনপদেই আমি রসূল প্রেরণ করি এবং সেখানকার মানুষ তাকে মিথ্যাজ্ঞান করে, যার ফলে আমি তাদেরকে অসুখ ও দারিদ্র্য দিয়ে পরীক্ষা করে থাকি, যার উদ্দেশ্য হয় যে, তারা যেন আল্লাহর পথে ফিরে আসে এবং তাঁর নিকট কাকুতি-মিনতি করে। بَأْسَاء শারীরিক কষ্টকে বুঝায়; যেমন অসুখ ও অসুস্থতা। আর ضَرَّاء বলা হয় অভাব ও দারিদ্র্যকে।

২। আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে দু'ধরণের পরীক্ষা নিয়েছেন। প্রথম পরীক্ষাটি নেয়া হয়েছে তাদেরকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে। তারা যখন তাতে অকৃতকার্য হয়, তখন দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেয়া হয় দারিদ্র, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির পরিবর্তে তাদের ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে। তাতে তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে এবং তা অনেক গুণে বেড়ে যায়। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা দুঃখ কষ্টের পরে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং এভাবে যেন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ফিরে আসে।যখন উভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়ে গেল এবং সতর্ক হল না, তখন আমি তাদেরকে আকস্মিক আযাবের মাধ্যমে ধরে ফেললাম এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন খবরই ছিল না

৩। আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিবেন মহান আল্লাহ, যে শর্তে তা হলো– ঈমান আনা ও তাকওয়া অবলম্বন। বরকত বলতে সব রকম কল্যাণ সবদিক থেকে খুলে দেয়া।

৪। তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে রাত্রিকালে, যখন তারা থাকবে ঘুমে মগ্ন ? অথবা দিনের বেলা, যখন তারা খেলাধুলায় মেতে থাকবে?

৫। তারা কি আল্লাহর কৌশল থেকেও নিরাপদ হয়ে গেছে? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর কৌশলকে নিরাপদ মনে করে না। এ আয়াতে যে 'মকর' বা কৌশল অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে, তা আল্লাহর এক গুণ। তিনি তার বিরোধীদের পাকড়াও করার জন্য যে কৌশলই অবলম্বন করেন তা অবশ্যই প্রশংসাপূর্ণ গুণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

Sisters'Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ১৩তম রুকুর (১০০-১০৮) আয়াত

১। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের স্থানে স্থানে এ বিষয়টি বার বার উল্লেখ করে মানুষকে পূর্ববর্তী জাতিদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন পাপের ফলে শুধু আযাবই আসে না; বরং অন্তরে তালাও লেগে যায়। তখন বড় বড় আযাবও তাদেরকে গাফলতির ঘুম থেকে জাগাতে পারে না। অন্যান্য স্থানের মত এখানেও মহান আল্লাহ প্রথমতঃ এ কথা বলেছেন যে, যেমন পূর্বের জাতিগুলিকে আমি তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করেছি, আমি চাইলে তোমাদেরকেও তোমাদের কার্যকলাপের জন্য ধ্বংস করতে পারি, আর দ্বিতীয়তঃ পাপের পর পাপ করতে থাকলে অন্তরে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়, যার পরিণতিতে সত্যের আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছে না। আর তখন ভীতি-প্রদর্শন বা উপদেশ তাদের জন্য কোন কাজে লাগে না।

২। তাদের অন্তর মানবিক বুদ্ধিবৃত্তির এমন একটি মনস্তাত্বিক নিয়মের আওতাধীন হয়ে যায়, যার দৃষ্টিতে একবার জাহেলী বিদ্বেষ বা হীন ব্যক্তি স্বার্থের ভিত্তিতে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার পর মানুষ নিজের জিদ ও হঠকারিতার শৃংখলে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে যেতে থাকে যে, তারপর কোন প্রকার যুক্তি-প্রমাণ, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা, নিরীক্ষাই সত্যকে গ্রহণ করার জন্য তার মনের দুয়ার খুলে দেয় না।তার পাপই তাদের ঈমান গ্রহণ না করার কারণ হয়ে দাঁড়াল এবং ঈমান আনার শক্তিই তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল। এ কথাকে পরবর্তী শব্দসমূহে 'সীল বা মোহর মেরে দেন' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৩। এখান থেকে কেউ কেউ 'রূহ' বা আত্মা-জগতে যে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, তা বুঝিয়েছেন। আবার কেউ বলেন, আযাব বা শাস্তি দূর করার জন্য নবীদের সঙ্গে তারা যে অঙ্গীকার করত, তা বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ সাধারণ অঙ্গীকার অর্থ নিয়েছেন; যা তারা এক অপরের সঙ্গে করত। এই অঙ্গীকার ভঙ্গ যে ধরণের হোক, তা ফিসক (পাপাচার) বলে গণ্য।

৪। এখান হতে মূসা (আঃ)-এর বর্ণনা শুরু হচ্ছে, যাকে মিসরের ফিরআউন ও তার জাতির নিকট মু'জিযা ও দলীল-প্রমাণ দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তারা তা গ্রহন করেনি, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম ডুবিয়ে মারা হয়েছে।

৫। মূসা বলল, 'হে ফিরআউন! আমি বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত (রসূল)।মুসা আলাইহিস সালামকে দুটি জিনিসের দাওয়াত সহকারে ফেরাউনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এক, আল্লাহর বন্দেগী তথা ইসলাম গ্রহণ করো। দুই, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়, যারা আগে থেকেই মুসলিম ছিল, তাদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করে তাদেরকে মুক্ত করে দাও।

৬। ফিরআউন নিদর্শন দেখতে চায়।বাস্তবিকই যদি তুমি কোন মু'জিযা নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থাপন কর যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।মূসা আ তার দাবী মেনে নিয়ে স্বীয় লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিলেন, আর অমনি তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়ে গেল। 'সূ'বান' বলা হয় বিরাটকায় অজগরকে।

৭। অপরটি হল হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নীচে দাবিয়ে বের করে আনলে তার প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠা। প্রথম মু'জিযাটি ছিল বিরোধীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য আর দ্বিতীয়টি তাদেরকে আকৃষ্ট করে আনার উদ্দেশ্যে। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, মূসা আলাইহিস সালামের শিক্ষায় হেদায়াতের জ্যোতি রয়েছে আর সেটির অনুসরণ ছিল কল্যাণের কারণ।

Sisters'Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ১৪তম রুকুর (১০৯-১২৬) আয়াত-১ম স্লাইড

১। শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোন সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতৃবর্গকে বুঝানোর জন্য। অর্থ হচ্ছে, ফিরআউন সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এসব মু'জিযা দেখে তাদের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বললঃ এ যে বড় পারদর্শী জাদুকর।

২। ভ্রান্তবাদীরা যেমন সত্যকে গোপন করার জন্য এবং তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বাস্তব ও সঠিক বিষয়ের উপর মিথ্যার শিরোনাম লাগিয়ে থাকে, ফিরআউন এবং তার সম্প্রদায়ের নেতারাও তাই করল। বললঃ তিনি বড় বিজ্ঞ জাদুকর এবং তার উদ্দেশ্য হল তোমাদের দেশ দখল করে নিয়ে তোমাদেরকে বের করে দেয়া। কাজেই তোমরাই বল এখন কি করা উচিত?

৩। সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ দিল যে, ইনি যদি জাদুকর হয়ে থাকেন এবং জাদুর দ্বারাই আমাদের দেশ দখল করতে চান, তবে তার মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। আমাদের দেশেও বহু বড় বড় অভিজ্ঞ জাদুকর রয়েছে; যারা তাকে জাদুর দ্বারা পরাভূত করে দেবে। কাজেই কিছু সৈন্য সামন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিন। তারা সব শহর থেকে জাদুকরদেরকে ডেকে নিয়ে আসবে। আল্লাহ্ তা'আলার রীতিও ছিল তাই প্রত্যেক যুগের নবী-রাসূলকেই তিনি সে যুগের জনগণের কাছে বহুল প্রচলিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত মু'জিযা দান করেছেন

৪। ফিরআউনের জাদুকররা প্রথমে এসেই মজুরী নিয়ে দরকষাকষি করতে শুরু করল। তার কারণ যারা ভ্রান্তবাদী পার্থিব লাভই হল তাদের মূখ্য।আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? শুনে ফিরআউন বলল, পারিশ্রমিকই নয়; বরং তোমরা আমার নৈকট্যপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে।

৫। প্রতিদ্বন্দিতার জন্য যখন মাঠে গিয়ে সবাই উপস্থিত, তখন জাদুকররা মূসা 'আলাইহিস সালামকে বললঃ হয় আপনি প্রথমে নিক্ষেপ করুন অথবা আমরা প্রথম নিক্ষেপ করি। সম্ভবত তারা নিজেদের নিশ্চয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্যই তা বলেছিল।

৬। মূসা আলাইহিস সালাম তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নিয়ে নিজের মু'জিযা সম্পর্কে আশ্বস্ততার দরুন প্রথম তাদেরকেই সুযোগ দিলেন। বললেন, "তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর"। কারণ, তাদের কর্মকাণ্ডের পর মু'জিযা বের হলে সেটা তাদের অন্তরে কঠোরভাবে রেখাপাত করতে বাধ্য হবে।

৭। জাদুকররা যখন তাদের লাঠি ও দড়িগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল, তখন দর্শকদের নযরবন্দী করে দিয়ে তাদের উপর ভীতি সঞ্চারিত করে দিল এবং মহাজাদু দেখাল। এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের জাদু ছিল এক প্রকার নযরবন্দী যাতে দর্শকদের মনে হতে লাগল যে, এই লাঠি আর দড়িগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল তেমনি লাঠি ও দড়ি যা পূর্বে ছিল, সাপ হয়নি। এটা এক রকম সম্মোহনী, যার প্রভাব মানুষের কল্পনা ও দৃষ্টিকে ধধিয়ে দেয়।

৮। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জাদুকরদের বিপরীতে মূসা আলাইহিস সালামকে কিভাবে সহযোগিতা করেছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে বলেনঃ আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম যে, আপনার লাঠিটি মাটিতে ফেলে দিন। তা মাটিতে পড়তেই সবচেয়ে বড় সাপ হয়ে সমস্ত সাপগুলোকে গিলে খেতে শুরু করল, যেগুলো জাদুকররা জাদুর দ্বারা প্রকাশ করেছিল।ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল তা বাতিল হয়ে গেল।সেখানে তারা পরাভূত ও লাঞ্ছিত হল।জাদুকরেরা সিজদাবনত হল। যাদুকরেরা যাদু ও তার আসলত্বকে ভাল ভাবেই জানত। সেই জন্য তারা মূসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনার কথা ঘোষণা করে দিল।

Sisters' Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ১৪তম রুকুর (১০৯-১২৬) আয়াত-২য় স্লাইড

৯। যাদুকরেরা সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর ঈমান আনার কথা ঘোষণা করল। যাতে ফিরআউনের দলের লোকেদের ধোঁকায় পড়ার সম্ভাবনা ছিল যে, তারা ফিরআউনকেই সিজদা করছে। কেননা, তারা তাকে উপাস্য ও প্রতিপালক বলে মান্য করত। সেই জন্য তারা মূসা ও হারূনের প্রতিপালক বলে এ কথা পরিষ্কার করে দিল যে, আমরা এই সিজদা সারা জাহানের প্রতিপালককে করছি, যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক; মানুষের বানানো কোন প্রতিপালককে নয়।

১০। এটা একটা ষড়যন্ত্র যা তোমরা প্রতিদ্বন্দিতার মাঠে আসার পূর্বেই শহরের ভেতরে নিজেদের মধ্যে স্থির করে রেখেছিল। তারপর জাদুকরদেরকে লক্ষ্য করে বললঃ তোমরা কি আমার অনুমতির পূর্বেই ঈমান গ্রহণ করে ফেললে।এসব যা কিছুই ঘটল, তা ফিরআউনের জন্য বড় আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর ছিল। সেই জন্য সে কিছু না বুঝে বলে ফেলল, ‘তোমরা সকলেই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমার রাজত্ব শেষ করতে চাও। আচ্ছা! তোমরা অচিরেই এর পরিণাম জানতে পারবে।’

১১। ফিরআউন মূল বিষয়টাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার মত চালাকীর পর সবার উপর নিজের আতঙ্ক এবং সরকারের প্রভাব ও ভীতি সঞ্চার করার জন্য জাদুকরদের হুমকি দিতে আরম্ভ করল। প্রথমে অস্পষ্ট ভঙ্গিতে বলল, “তোমাদের যে কি পরিণতি, তোমরা এখনই দেখতে পাবে” অতঃপর তা পরিস্কারভাবে বলল, “আমি তোমাদের সবার বিপরীত দিকের হাত-পা কেটে তোমাদের সবাইকে শূলীতে চড়াব”। তারা বলল, ‘আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাব। এর একটি অর্থ হল, যদি তুমি আমাদের সাথে এরূপ ব্যবহার কর, তাহলে তোমার প্রস্তুত থাকা উচিত যে, পরকালে মহান আল্লাহ তোমার এই পাপের কঠিন শাস্তি দেবেন। কারণ মৃত্যুর পর তারই নিকট আমাদের সকলকেই ফিরে যেতে হবে। আর তাঁর শাস্তি হতে কে পরিত্রাণ পাবে? যেন ফিরআউনকে পৃথিবীর শাস্তিদানের পরিবর্তে পরকালের শাস্তির ভয় দেখানো হল।

১২। তোমার নিকট আমাদের এটিই দোষ, যার কারণে তুমি আমাদের উপর অসন্তুষ্ট আর আমাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর হয়েছ। যদিও এটা কোন দোষ নয়; বরং এটি একটি সদগুণ যে, যখন সত্য আমাদের সামনে প্রকাশ হয়ে গেছে, তখন তার পরিবর্তে পার্থিব সকল স্বার্থকে ত্যাগ করে সত্যকে গ্রহণ করেছি। অতঃপর তারা ফিরআউনের সাথে কথা শেষ করে মহান আল্লাহকে সম্বোধন করে তাঁর দরবারে দু’আ করতে লাগল।

১৩। رَبَّنَآ اَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسۡلِمِيۡنَ

হে আমাদের রব! আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিমরূপে আমাদেরকে মৃত্যু দিন। আয়াতঃ১২৬

Sisters’Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ১৫তম রুকুর (১২৭-১২৯) আয়াত

১। প্রত্যেক যুগের ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অভ্যাস যে, তারা আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াতকে ফাসাদ, অশান্তি বা বিপর্যয় বলে অভিহিত করে। ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণও তাই বলল। তার জাতির নেতা শ্রেণীর লোকেরা বলতে লাগল যে, কিভাবে এরা আপনাকে এবং আপনার মা'বুদদের ইবাদত ত্যাগ করার মত দুঃসাহস দেখাতে পারে?

২। ফিরআউনের সভাষদ নেতা গোছের লোকেরা ফিরআউনকে বলল যে, তাহলে কি তুমি মূসা এবং তার সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দেবে, যাতে তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদেরকে পরিহার করে দেশময় দাঙ্গা-ফাসাদ করতে থাকবে? এতে বাধ্য হয়ে ফিরআউন বললঃ তার বিষয়টি আমাদের পক্ষে তেমন চিন্তার বিষয় নয়। আমরা তাদের জন্য এই ব্যবস্থা নেব যে, তাদের মধ্যে কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করব শুধু কন্যা-সন্তানদের বাঁচতে দেব। যার ফলে কিছুকালের মধ্যেই তাদের জাতি পুরুষশূন্য হয়ে পড়বে; থাকবে শুধু নারী আর নারী। আর তারা হবে আমাদের সেবাদাসী।

৩। যখন ফিরআউনের পক্ষ থেকে এই হত্যার অত্যাচার দ্বিতীয়বার শুরু হল, তখন মূসা (আঃ) নিজ জাতিকে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার ও ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিলেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, তোমরা যদি সঠিক পথে থাক, তাহলে পৃথিবীর শাসন-ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত তোমাদের হাতেই সোপর্দ করবেন। বিপদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তাদেরকে দুটি বিষয় শিক্ষাদান করলেন। (এক) শত্রুর মোকাবেলায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা এবং (দুই) কার্যসিদ্ধি পর্যন্ত সাহস ও ধৈর্য ধারণ।

৪। তারা বলল, আপনি আমাদের কাছে আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনি আসার পরও। তিনি বললেন, শীঘ্রই তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে যমীনে স্থলাভিষিক্ত করবেন, তারপর তোমরা কি কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন।
এখন দুঃখ-কষ্ট দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। পরে নিয়ামত, সম্মান ও রাজ্য দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে।

Sisters' Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ১৬তম রুকুর (১৩০-১৪১) আয়াত

১। আর অবশ্যই আমরা ফিরআউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল ফসলের ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে অনাবৃষ্টি ও ফসলাদিতে পোকা-মাকড় লেগে যাওয়ার কারণে উৎপাদন কমে যাওয়া। পরীক্ষার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, অত্যাচার ও অহংকারের পথ পরিহার করুক, যাতে তারা মেতে ছিল।

২। কল্যাণের সকল অংশকে নিজেদের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল মনে করত। আর অকল্যাণ তথা অনাবৃষ্টি ও ফসল না হওয়ার সকল দোষ মূসা (আঃ) ও তাঁর উপর উপর চাপিয়ে দিয়ে বলত যে, 'তোমাদের অশুভ আগমনের এই কুফল আমাদের দেশে পড়েছে।'

৩। (তাদের অশুভ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন)এর অর্থ হল, তাদের অশুভ আল্লার জ্ঞানায়ত্ত। আর তা হল তাদের কুফরী ও অস্বীকার; না অন্য কিছু। অথবা তাদের অশুভ আল্লাহর পক্ষ হতে, আর তার কারণ তাদের কুফরী।

৪। মু'জিযা ও আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে এখনো পর্যন্ত তারা যাদুকরের কাজ বলেই মনে করত- বলতো যে আমরা তোমার উপর ঈমান আনব না।

৫। অতঃপর আমরা তাদের উপর তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত বিস্তারিত নিদর্শন হিসেবে প্রেরণ করি। এরপরও তারা অহংকার করল। আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামকে নয়টি নিদর্শন দান করেছিলেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ফিরআউনের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে সত্য পথে আনা। আলোচ্য আয়াতে এই নয়টি নিদর্শন সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

৬।এসব আযাবে অসহ্য হয়ে সবাই মূসা আলাইহিস সালামের কাছে পাকাপাকি ওয়াদা করল যে, তারা এ সমস্ত আযাব থেকে মুক্তি পেলে মূসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান আনবে। মূসা আলাইহিস সালাম দোআ করলেন, ফলে তারা এ সমস্ত আযাব থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু যে জাতির উপর আল্লাহর আযাব চেপে থাকে, তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান-চেতনা কোন কাজই করে না। কাজেই এ ঘটনার পরেও আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে এরা আবারও নিজেদের হঠকারিতায় আঁকড়ে বসল এবং ঈমান আনতে অস্বীকার করল।

৭। বড় বড় নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনার জন্য ও গাফিলতির ঘুম হতে জাগার জন্য প্রস্তুত হল না। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারা হল।

৮। বানী ইস্রাঈল; যাদেরকে ফিরআউন দাস বানিয়ে রেখেছিল এবং যাদের উপর নানাভাবে যুলুম করত। এই দিক দিয়ে বাস্তবে মিসরে তাদেরকে দুর্বল মনে করা হত। কেন না তারা ছিল পরাভূত ও পরাধীন দাস। কিন্তু আল্লাহ যখন ইচ্ছা করলেন, তখন সেই পরাভূত ও দাস জাতিকে সেই ফিরআউনী রাজ্যের উত্তরাধিকারী বানালেন। যেহেতু তারা ধৈর্য ধরেছিল, আর ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করেছি।

৯। এর থেকে বড় মূর্খতা ও বোকামি আর কি হতে পারে যে, যে মহান আল্লাহ ফিরআউনের মত বড় শত্রুর হাত হতে তাদেরকে শুধু পরিত্রাণ দেননি; বরং তাদেরই চোখের সামনে তাকে তার সৈন্য সামন্তসহ ডুবিয়ে মারলেন এবং তাদেরকে অলৌকিকভাবে সমূদ্র পার করিয়ে দিলেন, সেই আল্লাহকেই তারা সমুদ্র পার হয়েই ভুলে গিয়ে নিজ হাতে গড়া পাথরের মূর্তির খোঁজ শুরু করে। বলা হয় যে, তাদের ঐ মূর্তিগুলো গাভীর আকারে পাথরের তৈরী ছিল। ই সব মূর্তিপূজারী যাদের অবস্থা তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে, তাদের ভাগ্যই হল ধ্বংস হওয়া ও তাদের এই কর্ম বাতিল ও ক্ষতিকর।

Sisters' Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ১৭তম রুকুর (১৪২--১৪৭) আয়াত

১। ফিরআউন ও তার দলবলকে ধ্বংস করার পর প্রয়োজন দেখা দিল যে, বানী ইস্রাঈলদের হিদায়াত ও পথ নির্দেশনার জন্য কোন ধর্মগ্রন্থ তাদেরকে দেওয়া হোক। সেই জন্য মহান আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে ত্রিশ রাত্রির জন্য তুর পাহাড়ে আহবান করলেন, পরে আরো দশ রাত্রি যোগ করে পুরো চল্লিশ রাত্রি করা হল।

২। মূসা (আঃ) যাওয়ার সময় তাঁর সহোদর ভাই নবী হারূন (আঃ)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন; যাতে তিনি বানী ইস্রাঈলদের মধ্যে হিদায়াত ও সংশোধনের কাজ চালিয়ে যান এবং তাদেরকে সকল বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন। এই আয়াতে এ সব কথাই বর্ণিত হয়েছে।

৩। যখন মূসা (আঃ) তুর পাহাড়ে গেলেন। সেখানে মহান আল্লাহ তাঁর সাথে সরাসরি কথা বললেন। মূসা (আঃ)-এর অন্তরে আল্লাহকে দেখার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হল এবং নিজের মনের কথা رَبِّ أَرِنِي হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও) বলে প্রকাশ করলেন। যার উত্তরে মহান আল্লাহ বললেন, لَن تَرَانِي তুমি আমাকে কখনই দেখবে না) পৃথিবীর মানুষের কোন চোখ মহান আল্লাহকে দেখতে সক্ষম নয়। কিন্তু পরকালে মহান আল্লাহ এই চোখে এমন দৃষ্টিশক্তি দান করবেন, যা আল্লাহর নূরকে সহ্য করতে পারবে।

৪। ঐ পাহাড়ও মহান আল্লাহর প্রকাশ হওয়াকে সহ্য করতে পারল না এবং মূসা (আঃ)ও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। নবী (সাঃ) বলেছেন, ‘‘কিয়ামত দিবসে সবাই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। (এই জ্ঞানশূন্যতা ইবনে কাসীরের মতে ঐ সময় হবে যখন হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহ বিচারের জন্য আবির্ভূত হবেন।) অতঃপর যখন সবাই জ্ঞান ফিরে পাবে, তখন আমিই সর্বপ্রথম জ্ঞানপ্রাপ্ত হব এবং দেখব যে, মূসা (আঃ) আরশের পায়া ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আমি জানি না যে, তিনি আমার আগেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন, নাকি তুর পাহাড়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁকে হাশরের ময়দানে সংজ্ঞাহীন হওয়া থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছে।’’ (বুখারীঃ তাফসীর সূরাতুল আরাফ, মুসলিমঃ মূসা (আঃ)-এর ফযীলত)

৫। তিনি (আল্লাহ) বললেন, হে মূসা! আমি আমার রিসালাত ও বাক্য দ্বারা লোকের মধ্যে তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, সুতরাং আমি যা দিলাম, তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।

৬। তাওরাত কাষ্ঠফলক বা তক্তি রূপে দান করা হয়েছিল। যাতে তাদের ধর্মীয় আহকাম, আদেশ-নিষেধ, অনুপ্রেরণা দান, ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি সকল কিছুর বিস্তারিত বিদ্যমান ছিল। ‘‘সুতরাং এগুলিকে শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে ঐগুলির মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্রই সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাব’’। বাসস্থান বলতে তাদের পরিণাম, অর্থাৎ, ধ্বংস। অথবা এর অর্থ ফাসেক (সত্যত্যাগী)-দের দেশে তোমাদেরকে শাসনক্ষমতা দান করব। আর তা হল শাম দেশ। যেখানে আমালেকাদের আধিপত্য ছিল; যারা ছিল আল্লাহর অবাধ্য। (ইবনে কাসীর)

৭। আয়াতে গর্ব বা অহংকারের অর্থ হল, মহান আল্লাহর আয়াত ও আহকামের মোকাবেলায় নিজেকে বড় মনে করা এবং অন্য লোকদের তুচ্ছ মনে করা।এই আয়াতে অহংকারের পরিণতিও ব্যক্ত করা হয়েছে। আর তা এই যে, মহান আল্লাহ নিজ আয়াত (নিদর্শন) হতে দূরে রাখেন এবং সে এত দূরে সরে যায় যে, কোন প্রকার নিদর্শন তাকে হকের (সত্যের) পথে আনতে সফল হয় না।

৮। আল্লাহর বিধি-বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে তাদের আরো একটি আচরণ ও অভ্যাস এই যে, হিদায়াতের কথা তাদের সামনে এলে মেনে নেয় না; কিন্তু ভ্রষ্টতার কোন জিনিস দেখলেই তারা তা সাদরে গ্রহণ করে। যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলে, তাদের কার্য নিষ্ফল হবে। তারা যা করবে সেই অনুযায়ীই তাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে।

Sisters' Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ১৮তম রুকুর (১৪৮-১৫১) আয়াত

১। আর মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি বাছুর তৈরী করল, একটা দেহ, যা ‘হাম্বা’ শব্দ করত। তারা কি দেখল না যে, এটা তাদের সাথে কথা বলে না এবং তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা এটাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল এবং তারা ছিল যালেম।

মূসা (আঃ) যখন চল্লিশ রাত্রির জন্য তূর পাহাড়ে গেলেন, তখন সামেরী নামক এক ব্যক্তি সম্প্রদায়ের সোনার অলংকার জমা করে তা থেকে একটি বাছুর তৈরী করল। যার মধ্যে জিবরীল (আঃ)-এর ঘোড়ার পায়ের নীচের কিছু মাটি মিশিয়ে দিল যা তার কাছে রাখা ছিল এবং যার মধ্যে মহান আল্লাহ প্রাণ-প্রতিষ্ঠার শক্তি রেখেছিলেন। যার কারণে বাছুরটি গরুর মত শব্দ করত। (যদিও পরিষ্কার কথা বলতে ও পথ-নির্দেশ করতে অক্ষম ছিল; যেমন কুরআনের ভাষায় স্পষ্ট।) এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, সেটি সত্যি সত্যি রক্ত-মাংসের বাছুরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, নাকি সেটি ছিল সোনারই, কিন্তু কোন প্রকারে তাতে হাওয়া প্রবেশ করার ফলে গরুর মত শব্দ বের হত। (ইবনে কাসীর) এই শব্দ দ্বারাই সামেরী বানী ইস্রাঈলকে এই বলে পথভ্রষ্ট করল যে, এটিই তোমাদের মাবূদ (উপাস্য)। মূসা (আঃ) ভুলে গেছেন এবং তিনি উপাস্যের খোঁজে তূর পাহাড়ে গেছেন।

২। سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ এটি একটি পরিভাষা, যার অর্থঃ লজ্জিত বা অনুতপ্ত হওয়া। তাদের এ অনুতাপ মূসা (আঃ)-এর ফিরে আসার পর হল, যখন তিনি তাদেরকে এর উপর তিরস্কার করলেন ও ধমক দিলেন।তারা বলল, ‘আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব।

৩। মূসা (আঃ) যখন এসে দেখলেন যে, তারা বাছুরের পূজা শুরু করেছে, তখন অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন।তখতীগুলোকে ফেলে দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ফলকের অসম্মান ছিল না; বরং দ্বীনী আত্মসম্মানবোধে আত্মহারা হয়ে বিনা ইচ্ছায় তিনি এ রকমটি করে ফেলেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ “কানে শুনা খবর কখনো চাক্ষুষ দেখার মত হয় না। মহান আল্লাহ্ মূসাকে বাছুর নিয়ে কি করেছে তা জানানোর পরে তিনি তখতিগুলোকে ফেলে দেন নি, তারপর যখন তাদের কর্মকাণ্ড স্বচক্ষে দেখলেন। তখন তখতীগুলোকে ফেলে দিলেন। ফলে সেগুলো ভেঙ্গে যায়। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৭১]

(মাথায় ধরে অথবা চুলে ধরে।) হারূন (আঃ) এখানে (মূসা (আঃ)-কে ভাই না বলে) মায়ের পুত্র বললেন। কারণ এ শব্দে মমতা বোধ ও ভালবাসা বেশি পাওয়া যায়। হারূন (আঃ)-এর এই ওযর ছিল; যার কারণে তিনি জাতিকে শিরকের মত ভয়ানক পাপ থেকে বাধা দিতে সক্ষম হননি। এক তো নিজের দুর্বলতা, আর দুই বানী ইস্রাঈলের বিরোধিতা ও ঔদ্ধত্য; এমনকি (বারণ করার ফলে) তারা তাঁকে হত্যা পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়। ফলে তাঁকে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য চুপ থাকতে হয়। আর এ মত ক্ষেত্রে চুপ থাকার অনুমতি মহান আল্লাহও দিয়ে রেখেছেন।”সুতরাং তুমি আমাকে নিয়ে শত্রু হাসায়ো না এবং আমাকে অনাচারীদের দলভুক্ত গণ্য করো না”

৪। মূসা (আঃ) নিজের জন্য ও ভাই হারূনের জন্য ক্ষমা ও দয়া চেয়ে দু’আ করলেন।

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِاَخِيْ وَ اَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۱۵۱

‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদেরকে তোমার করুণায় আশ্রয় দান কর। আর তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।’আয়াতঃ১৫১

Sisters' Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ১৯তম রুকুর (১৫২-১৫৭) আয়াত

১। "(আল্লাহ বললেন,) নিশ্চয় যারা গোবৎসকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছে অচিরেই পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আসবে।আর এভাবে আমি অপবাদ রচনাকারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি"।আল্লাহর গযব (ক্রোধ) এই ছিল যে, তাদের তওবার জন্য হত্যা আবশ্যিক করা হল। আর এর পূর্বে তারা যতদিন জীবিত থাকল লাঞ্ছনা ও অপমানের উপযুক্ত বলে গণ্য হল।

২। যারা তওবা করে, আল্লাহ তাদের জন্য চরম ক্ষমাশীল পরম দয়াবান। জানা গেল যে, তওবার কারণে সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে শর্ত এই যে, তওবা বিশুদ্ধ হতে হবে। আয়াতে সেসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা মূসা আলাইহিস্ সালামের সতর্কীকরণের পর নিজেদের এই অপরাধের জন্য তাওবাহ করে নিয়েছে এবং তাওবাহর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কঠোরতর শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, তাদেরই একজন অপরজনকে হত্যা করতে থাকলেই তাওবাহ কবুল হবে- তারা সে শর্তও পালন করল, তখন মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলা নির্দেশক্রমে তাদেরকে বললেনঃ তোমাদের সবার তাওবাহই কবুল হয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তারা শহীদ হয়েছে আর যারা বেঁচে রয়েছে, তারা এখন ক্ষমাপ্রাপ্ত। [তাবারী]

৩। আয়াতে বলা হয়েছে যে, মূসা আলাইহিস সালামের রাগ যখন প্রশমিত হয়,তখন তাড়াতাড়ি ফেলে রাখা তাওরাতের তখতিগুলি আবার তুলে নিলেন। وانسخة সংকলন বলা হয় সে লেখাকে যা কোন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, মূসা আলাইহিস সালাম ক্রোধবশত যখন তাওরাতের তখতিগুলি মাথা থেকে তাড়াহুড়া করে নামিয়ে রাখেন, তখন সেগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা পরে অন্য কোন কিছুতে লিখে তাওরাত দিয়েছিলেন, একেই নোসখা বলে।

৪। মূসা (আঃ) নিজ জাতির সত্তরজন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করলেন এবং তাদেরকে তুর পাহাড়ে নিয়ে গেলেন; যেখানে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হল। যেখানে তাদের উপর বিদ্যুৎ (বজ্র) রূপে মৃত্যু নেমে এসেছিল। আর এখানে ভূমিকম্পন দ্বারা মৃত্যুর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, হতে পারে দুই আযাবই তাদের উপর এসেছিল; আকাশ হতে বজ্র ও পৃথিবী হতে ভূমিকম্প। যাই হোক, মূসা (আঃ) দু'আ ও দরখাস্ত করে বললেন, তাদের জন্য যদি ধ্বংসই অবধারিত ছিল, তাহলে এর পূর্বে যখন তারা বাছুর-পূজায় নিমগ্ন ছিল, তখনই ধ্বংস করতেন।---' সুতরাং তার ফলে মহান আল্লাহ তাদেরকে পুনর্জীবন দান করলেন।

৫। ১৫৫ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ
وَ اكْتُبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ

তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল।এবং আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারণ কর, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি। আয়াত ১৫৫-১৫৬ কিছু

৬। আল্লাহ বললেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা (দয়া) তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা সাবধান হয়, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে।

৭। আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা এর দুটি পদবী 'রাসূল' ও 'নবী' এবং এর সাথে সাথে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য 'উম্মী'-এরও উল্লেখ করা হয়েছে। ৪টি কাজ (ক)তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন,(খ) অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন,(গ)তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেন (ঘ) তাদের গুরুভাব ও শৃংখল হতে মুক্ত করেন যা তাদের উপর ছিল। কাজেই যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে নাযিল হয়েছে সেটার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম।

Sisters' Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ২০তম রুকুর (১৫৮-১৬২) আয়াত

১। আয়াতে ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে রিসালাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা এর রিসালাত সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত জিন ও মানবজাতি তথা কেয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের বংশধরদের জন্য ব্যাপক। তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তার রাসূল উম্মী নবীর প্রতি যিনি আল্লাহ ও তার বাণীসমূহে ঈমান রাখেন। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।

২। আর মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দল রয়েছে যারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও সে অনুযায়ীই (বিচারে) ইনসাফ করে।কুরআন নাযিল হবার সময় বনী-ইসরাঈলীদের মধ্যে কিছু লোকের যে নৈতিক ও মানসিক অবস্থা বিরাজমান ছিল তারই কথা এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।এরা হল সেসব লোক, যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের যুগে সেগুলোর হেদায়াত অনুযায়ী আমল করত এবং যখন খাতামুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়, তখন তাওরাত ও ইঞ্জীলের সুসংবাদ অনুসারে তার উপর ঈমান আনে এবং তার যথাযথ অনুসরণও করে

৩। ইয়াকূব (আঃ)-এর ১২টি সন্তান থেকে ১২টি গোত্র আবির্ভূত হল। মহান আল্লাহ প্রত্যেক গোত্রের জন্য এক একটি দলপতি (পর্যবেক্ষক) নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। ‘তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর।’ ফলে তা থেকে বারটি প্রস্রবণ উৎসারিত হল, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনে নিল। এবং মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম, তাদের নিকট ‘মান্ন্’ ও ‘সালওয়া’ পাঠালাম; (বললাম,) ‘তোমাদের যা পবিত্র রুযী দিয়েছি তা আহার কর।’ কিন্তু তারা নির্দেশ অমান্যকরল।

৪। আর স্মরণ কর, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, ‘এ জনপদে বাস কর ও যেখানে ইচ্ছা আহার কর এবং বল, ‘‘হিত্ত্বাহ’’ (ক্ষমা চাই) এবং নতশিরে (শহর)দ্বার প্রবেশ কর, আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব। আমি শীঘ্রই সৎকর্মশীলদের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করব।

৫। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা সীমালংঘনকারী ছিল, তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। সুতরাং তাদের সীমালংঘনের ফলে আমি আকাশ হতে তাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করলাম।

Sisters' Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ২১তম রুকুর (১৬৩-১৭১) আয়াত ১ম স্লাইড

১। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ জনপদটি সাগর তীরে ছিল। মদীনা ও মিশরের মাঝামাঝি। যাকে 'আইলা' বলা হত। [তাবারী] বর্তমানে এটাকে 'ঈলাত' বলা হয়। [আত-তাফসীরুস সহীহ] এমন মাছ যা পানির উপরি ভাগে ভেসে ওঠে। এখানে ইয়াহুদীদের ঐ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে তাদের শনিবার দিন মাছ শিকার করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষার জন্য শনিবার দিন বেশি বেশি মাছ পানির উপর ভেসে উঠত। আর এদিন পার হলে এমনটি আর হত না। শেষ পর্যন্ত ইয়াহুদীরা এক চালাকি অবলম্বন করে আল্লাহর আদেশ লংঘন করল। তারা সমুদ্র সংলগ্নে খাল খনন করেছিল, ফলে শনিবার তাতে মাছ প্রবেশ করে ফেঁসে যেত। অতঃপর শনিবার গত হলেই তা শিকার করত।

২। এই একদল বলতে সৎলোকের ঐ দলকে বুঝানো হয়েছে, যারা ঐ ধোঁকার কৌশল অবলম্বন করেনি এবং কৌশল অবলম্বনকারীদেরকে বুঝাতে বুঝাতে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। আরেকদল যারা তাদেরকে উপদেশ দান করত। সৎলোকের এই দল তাদেরকে বলত, এমন লোকেদেরকে উপদেশ দিয়ে কি লাভ, যাদের ভাগ্যে রয়েছে ধ্বংস ও আল্লাহর আযাব? অথবা এই দল বলতে ঐ সকল সীমালংঘনকারী আল্লাহর অবাধ্যদেরকে বুঝানো হয়েছে, যখন তাদেরকে উপদেশ দানকারীরা উপদেশ দিত, তখন তারা বলত যে, যখন তোমাদের ধারণায় আমাদের ভাগ্যে ধ্বংস ও আল্লাহর আযাবই আছে, তাহলে আমাদেরকে উপদেশ দাও কেন? তারা উত্তরে বলত প্রথমতঃ প্রতিপালকের নিকট ওযর পেশ করার জন্য, যাতে আমরাও আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচতে পারি। কারণ, পাপ করতে দেখা এবং বাধা দেওয়ার চেষ্টা না করাও এক পাপ। যার উপর আল্লাহর পাকড়াও হতে পারে। আর দ্বিতীয়তঃ হয়ত বা লোকেরা আল্লাহর আদেশ লংঘন করা হতে বিরত থাকতে পারে। প্রথম ব্যাখ্যার দিক দিয়ে তিনটি দল হয়ঃ (ক) আল্লাহর অবাধ্য ও শিকারকারী দল। (খ) এমন দল যারা শিকারকারীও ছিল না ও নিষেধকারীও ছিল না। (গ) এমন দল যারা অবাধ্য ছিল না; বরং সীমালংঘনকারীদের উপদেশ দিত। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার দিক দিয়ে দুটি দলের কথা বুঝা যায়ঃ প্রথম সীমালংঘনকারীদের এবং দ্বিতীয় নিষেধকারীদের দল।

৩। অতঃপর যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন যারা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করত তাদেরকে আমরা উদ্ধার করি। আর যারা যুলম করেছিল তাদেরকে আমরা কঠোর শাস্তি দেই, কারণ তারা ফাসেকী করত। "অতঃপর তারা যখন নিষিদ্ধ কাজ বাড়াবাড়ির সাথে করতে লাগল তখন আমরা তাদেরকে বললাম, ঘৃণিত বানর হও!"

৪। মহান আল্লাহ শপথ করে দৃঢ়তার সাথে বলছেন, তাদের(ইহুদী) উপর কিয়ামত পর্যন্ত এমন সব লোকেদেরকে আধিপত্য দান করবেন; যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে। সুতরাং ইয়াহুদীদের পুরো ইতিহাস লাঞ্ছনা, দারিদ্র্য দাসত্ব ও গোলামীর ইতিহাস। যার সংবাদ মহান আল্লাহ এই আয়াতে দিয়েছেন।

৫। এই আয়াতে ইয়াহুদীদের বিভিন্ন দলে উপদলে ভাগ হয়ে যাওয়ার ও তাদের মধ্যে কিছু লোকের সৎ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদেরকে দু'ভাবেই পরীক্ষা করার কথাও বলা হয়েছে; যাতে তারা নিজেদের দুষ্কর্ম থেকে ফিরে আসে ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

Sisters' Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ২১তম রুকুর (১৬৩-১৭১) আয়াত ২য় স্লাইড

৬। মুজাহিদ বলেন, এখানে অযোগ্য উত্তরপুরুষ বলে নাসারাদের বোঝানো হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন কাসীর বলেন, এখানে ইয়াহুদী, নাসারাসহ পরবর্তী সবাই উদ্দেশ্য হতে পারে। দুনিয়ার যে বস্তুতেই তাদের চোখ পড়বে, সেটা হালাল কিংবা হারাম যাই হোক না কেন, তারা তাই গ্রহণ করে, তারপর ক্ষমার তালাশে থাকে। আবার যদি আগামী কাল অনুরূপ কিছু নজরে পড়ে সেটাও গ্রহণ করে।

তারা আল্লাহর কিতাব পড়েছে কিন্তু কিতাবের হুকুমের বিরোধিতা করেছে। দুনিয়ার যত নিকৃষ্ট কামাই আছে যেমন ঘুষ ইত্যাদি তা-ই তারা গ্রহণ করে। কারণ তাদের লোভ ও লালসা প্রচণ্ড। তারা গোনাহ করে, তারা জানে এ কাজটি করা গুণাহ। তবুও এ আশায় তারা এ কাজটি করে যে, কোন না কোনভাবে তাদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর নামে কোন অসত্য কথা তারা বলবে না। তাওরাত কায়েম করবে, সে অনুযায়ী আমল করবে। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই উত্তম; তোমরা কি এটা অনুধাবন কর না?

৭। তাদের মধ্যে যারা তাকওয়া, পরহেযগারি ও সাবধানতার পথ অবলম্বন করবে, কিতাবকে শক্তভাবে ধারণ করবে; যার অর্থঃ আসল তাওরাতের উপর আমল করে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুঅতের উপর ঈমান আনবে, নামায ইত্যাদির উপর দৃঢ় থাকবে। তাহলে এমন সৎকর্মশীলদের কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করবেন না।

৮। সেই সময়ের ঘটনা, যখন মূসা (আঃ) তাদের নিকট তাওরাত নিয়ে এলেন ও তার আদেশ-নিষেধ পড়ে শোনালেন, তখন তারা অভ্যাস মত তার উপর আমল করতে অস্বীকৃতি জানাল এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। যার ফলে মহান আল্লাহ পাহাড়কে তাদের উপর তুলে ধরলেন যে, তোমাদেরকে পাহাড় চাপা দিয়ে শেষ করে দেওয়া হবে। যার ভয়ে তারা তাওরাতের উপর আমল করার অঙ্গীকার করল। কেউ কেউ বলেন, পাহাড় তাদের উপর তোলার ঘটনা তাদেরই দাবী অনুসারে ঘটেছিল।

Sisters' Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ২২তম রুকুর (১৭২-১৮১) আয়াত ১ম স্লাইড

১। স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তান-সন্ততি বাহির করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলে, 'নিশ্চয়ই। আমরা সাক্ষী রইলাম।' (এ স্বীকৃতি গ্রহণ) এ জন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে জানতাম না।' এটিকে 'আলাসতু' অঙ্গীকার বলা হয় যা أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ হতে তৈরী।

একটি সহীহ হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আরাফার দিনে নু'মান নামক জায়গায় মহান আল্লাহ আদম-সন্তান হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আদম (আঃ)-এর সকল সন্তানকে তার পৃষ্ঠদেশ হতে বের করলেন এবং তাদেরকে নিজের সামনে (পিঁপড়ের আকারে) ছড়িয়ে দিলেন ও তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কি তোমাদের রব (প্রভু) নই।' সকলে বলেছিল, بَلَى شَهِدْنَا অবশ্যই, আমরা সকলেই আপনার রব হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছি। (মুসনাদে আহমাদ, হাকেম ২/৫৪৪, সহীহাহ ১৬২৩নং)

২। আমি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি এবং নিজ প্রতিপালক হওয়ার সাক্ষ্য এই জন্যই নিয়েছিলাম, যাতে তোমরা কোন ওজর পেশ করতে না পার যে, আমরা তো অনবগত ছিলাম কিম্বা আমাদের পূর্বপুরুষেরা শির্কে লিপ্ত ছিল। এই ওজর কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ শুনবেন না।

৩। এ আয়াতে আল্লাহর নিদর্শণাবলী বর্ণনার কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে যে, আমরা নিদর্শনগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি, যাতে মানুষ শৈথিল্য, গাফলতি ও অনাচার থেকে ফিরে আসে। অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে কেউ যদি সামান্য লক্ষ্যও করে, তাহলে সে সেই সৃষ্টিলগ্নের প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির দিকে ফিরে আসতে পারে।

৪। আর তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনান যাকে আমরা দিয়েছিলাম নিদর্শনসমূহ, তারপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অতঃপর শয়তান তার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।-ব্যাখ্যাকারীগণ এটিকে এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য বলেছেন, যে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান রাখত; কিন্তু পরে পার্থিব ভোগ-বিলাস ও শয়তানের পিছে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তবে নির্দিষ্ট ব্যক্তি কে ছিল? তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এ ব্যাপারে কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। এটি সাধারণ ব্যাপার, এমন মানুষ প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক যুগে জন্ম নেয়। যে ব্যক্তিই এ রকম হবে তাকে এর দলভুক্ত করা হবে।

আর যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও সে অনুযায়ীই (বিচারে) ইনসাফ করে।

৫। আমি ইচ্ছা করলে এসব আয়াতের মাধ্যমে তাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করে দিতাম, দুনিয়ার পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি দিতে পারতাম। [ইবন কাসীর] কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঐ আয়াতসমূহ এবং সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হল প্রকৃত মর্যাদা ও উন্নতির কারণ। কিন্তু যে লোক এ সমস্ত আয়াতের যথার্থ সম্মান না দিয়ে পার্থিব কামনা-বাসনাকে আল্লাহর আয়াতসমূহ অপেক্ষা অগ্রাধিকার দেবে, তার জন্য এই জ্ঞানই মহাবিপদ হয়ে যাবে।

সে দুনিয়ার স্বার্থ, স্বাদ ও আরাম আয়েশের দিকে ঝুঁকে পড়ে। প্রবৃত্তির লালসার মুকাবিলা করার পরিবর্তে সে তার সামনে নতজানু হয়। উচ্চতর বিষয়সমূহ লাভের জন্য সে পার্থিব লোভ-লালসার উর্ধে উঠার পরিবর্তে তার মধ্যে এমনভাবে ডুবে যায় যার ফলে নিজের সমস্ত উচ্চতর আশা-আকাংখা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক উন্নতির সমস্ত সম্ভাবনা পরিত্যাগ করে বসে। ফলে শয়তান তার পেছনে লেগে যায় এবং অনবরত তাকে এক অধঃপতন থেকে আরেক অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে এ যালেম শয়তান তাকে এমন সব লোকের দলে ভিড়িয়ে দেয় যারা তার ফাঁদে পা দিয়ে বুদ্ধি বিবেক সব কিছু হারিয়ে বসেছিল।

Sister'sForum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ২২তম রুকুর (১৭২-১৮১) আয়াত ২য় স্লাইড

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ উদাহরণটি কুকুরের জন্য এ উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়েছে যে, তাকে কোন জ্ঞান ও হিকমতের কথা বললে সে তা নেয়ার মত যোগ্যতা রাখে না। আর যদি তাকে কোন কিছু না দিয়ে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হয়, তবে কোন কল্যাণই বয়ে আনতে পারে না। যেমনিভাবে কুকুর বসে থাকলেও হাঁপাতে থাকে। আর দৌড়ালেও হাঁপায়। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে চিন্তা করলে যে শিক্ষা আমরা পাই তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলোঃ

প্রথমতঃ কারো পক্ষেই নিজের জ্ঞান-গরিমা এবং ইবাদাত-বন্দেগীর ব্যাপারে গর্ব করা উচিত নয়। কারণ, সময় বদলাতে এবং বিপরীতগামী হতে দেরী হয় না। ইবাদাত-বন্দেগীর সাথে সাথে আল্লাহর শোকরগোযারী ও তাতে দৃঢ়তার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা এবং তার উপর ভরসা করা কর্তব্য। [কুরতুবী]

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ যে সমস্ত উদাহরণ পেশ করেছেন সেগুলোতে গবেষণা করলে জ্ঞান বাড়বে। আর জ্ঞান বাড়লে সেটা অনুযায়ী আমল করতে হবে। [সা'দী]

তৃতীয়ত: আল্লাহর আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণ স্বয়ং একটি আযাব এবং এর কারণে শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে গিয়ে আরো হাজার রকমের মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে দেয়। কাজেই যে লোককে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন, সাধ্যমত সে জ্ঞানের সম্মান দান এবং নিজ আমল সংশোধনের চিন্তা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত না থাকা তার একান্ত কর্তব্য।

চতুর্থত: এমন সব পরিবেশ ও কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, যাতে স্বীয় দ্বানী ব্যাপারে ক্ষতির আশংকা থাকে। বিশেষ করে ধন-সম্পদ, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসার ক্ষেত্রে সেই অশুভ পরিণতির কথা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

৬। সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত কত মন্দ যারা আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করে। আর তারা নিজদের প্রতিই যুলুম করত।

৭। আল্লাহ যাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায় এবং যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তার সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সেসবের উপর আপন নূরের জ্যোতি ফেললেন। যার উপর সে জ্যোতি পড়েছে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে আর যার উপর সে জ্যোতি পড়েনি সে পথভ্রষ্ট হবে। এজন্য আমি বলি, আল্লাহর জ্ঞানের উপর লিখে কলম শুকিয়ে গেছে। [তিরমিযীঃ ২৬৪২]

৮। আর আমরা তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দ্বারা তারা শুনে না; তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও বেশী বিভ্রান্ত। তারাই হচ্ছে গাফেল"। আমি তো তাদেরকে হৃদয়, মস্তিষ্ক, কান, চোখ সবকিছুসহ সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু এ বেকুফরা এগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করেনি এবং নিজেদের অসৎ কাজের বদৌলতে শেষ পর্যন্ত তারা জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তাদের আমলই তাদেরকে জাহান্নামের উপযুক্ত করেছে। তাদের জাহান্নাম দেয়া আল্লাহর ইনসাফের চাহিদা। তিনি যেহেতু আগে থেকেই জানেন যে, তারা জাহান্নামে যাবে, সুতরাং তাদেরকে যেন তিনি জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। [ফাতহুল কাদীর]

Sisters' Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ২২তম রুকুর (১৭২-১৮১) আয়াত ৩য় স্লাইড

৯। আয়াতে বলা হয়েছে যে, "সব উত্তম নাম আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই তোমরা তাকে সেসব নামেই ডাকো" এখানে উত্তম নাম বলতে সে সমস্ত নামকে বুঝানো হয়েছে, যা গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরকে চিহ্নিত করে।যে নামগুলোতে বিভিন্ন গুণের; তাঁর মহানুভবতা, মাহাত্ম্য ও শক্তি ইত্যাদি প্রকাশ পায়। সহীহায়নে তার সংখ্যা নিরানব্বই; এক কম একশত বলা হয়েছে।এসব আসমাউল-হুসনা বা উত্তম নামসমূহ একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বৈশিষ্ট্য

) إلحاد(ইলহাদ) এর অর্থ হল এক দিকে ঝুঁকে পড়া। আর এর থেকে 'লাহাদ' এসেছে। লাহাদ ঐ কবরকে বলা হয় যার একদিক খনন করা হয়। দ্বীনের মধ্যে ইলহাদ হল, বক্রপথ অবলম্বন করা বা ধর্মত্যাগী হওয়া। আল্লাহর নামসমূহে বক্রপথ অবলম্বন করা তিনভাবে হতে পারে

(ক) আল্লাহর নামের পরিবর্তন করা, যেমন মুশরিকরা করত।

(খ) আল্লাহর নামে মনগড়া অতিরিক্ত বা সংযোজন করা, যার আদেশ তিনি দেননি।

(গ) তাঁর নাম কম করে দেওয়া; যেমন, তাঁকে একটি নির্দিষ্ট নামেই ডাকা এবং অন্যান্য গুণবাচক নামে ডাকাকে খারাপ মনে করা। (ফাতহুল ক্বাদীর)

আল্লাহর নামসমুহে 'বক্রপথ অবলম্বন' করার একটি অর্থ এটাও হতে পারে যে, তার তা'বীল (অপব্যাখ্যা) করা অথবা তা অর্থহীন বা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া অথবা তার উপমা বা সদৃশ বর্ণনা করা। (আয়সারুত তাফাসীর) যেমন মু'তাযিলা, মুআত্তিলা, মুশাবিবহা ইত্যাদি পথভ্রষ্ট দলগুলোর আচরণ

১০। আর যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও সে অনুযায়ীই (বিচারে) ইনসাফ করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে একদল আল্লাহ্‌র সুনির্দিষ্ট নির্দেশ আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আদেশকে বাস্তাবায়ন করার জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। তাদেরকে কেউ মিথ্যারোপ করবে অথবা অপমান করবে তার পরোয়া তারা করবে না। [বুখারীঃ ৭৪৬০, মুসলিমঃ ১০৩৭]

Sisters' Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ২৩তম রুকুর (১৮২-১৮৮) আয়াত

১। দুনিয়াতে রিযিক ও জীবনোপকরণের ভাণ্ডার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন। ফলে তারা মনে করবে যে, তারা যা করে চলছে তা গ্রহণযোগ্য। এভাবেই তারা প্রতারিত হতে থাকবে। অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন। [ইবন কাসীর] সূরা আল-আনআমঃ ৪৪–৪৫ আয়াতেও তা এসেছে।

২। আর আমি তাদেরকে ঢিল দেব, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। এ হল সেই ঢিল; যাতে অবকাশ দিয়ে ধীরে ধীরে পাকড়াও করা হয়; যা মহান আল্লাহ পরীক্ষাস্বরূপ ব্যক্তি ও জাতিকে দিয়ে থাকেন। যখন তার পাকড়াও করার ইচ্ছা হয়, তখন তাঁর শক্তি থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। কারণ তাঁর কৌশল অতি শক্ত।

৩। নবুওয়াত লাভের পর যে-ই রাসূল সা মানুষের কাছে আল্লাহর দাওয়াত পৌছাতে শুরু করলেন, অমনি তাকে পাগল বলা আরম্ভ হয়ে গেল।

"বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিঃ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু-দুজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও, তারপর তোমরা চিন্তা করে দেখ— তোমাদের সাথীর মধ্যে কোন উন্মাদন নেই। আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তিনি তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী মাত্র।" [সাবা: ৪৬] অর্থাৎ তিনি(রাসূল সা) তাদের মধ্যেই জন্মলাভ করেন। তাদের মধ্যে বসবাস করেন। শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে পদার্পন করেন। নবুওয়াত লাভের পূর্বে সমগ্র জাতি তাকে একজন অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট-ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাব প্রকৃতি ও সুস্থ মন-মগজধারী মানুষ বলে জানতো।

৪। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের প্রতি, আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি তারা চিন্তা-ভাবনা করত, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহর উপর ঈমান আনত, তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত ও তাঁর অনুসরণ করত, তারা যে আল্লাহর সাথে শিরক করে তা ত্যাগ করত এবং এ ব্যাপারে ভয় করত যে, তাদের মৃত্যু যেন তাদের কুফরীর অবস্থায় থাকাকালীন না আসে।) حديثকথা বা বাণী) বলতে কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, নবী (সাঃ)-এর সতর্ক করা ও ভয় দেখানো এবং কুরআন মাজীদ (পড়া বা শোনার) পরও যদি তারা ঈমান না আনে, তাহলে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য আর কি হতে পারে, যা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হলে তারা ঈমান আনবে? আল্লাহ যাদেরকে বিপথগামী করেন তাদের কোন পথপ্রদর্শক নেই। আর তিনি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে দেন

৫। আয়াতগুলো নাযিলের পেছনে বিশেষ একটি ঘটনা কার্যকর ছিল। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, জাবাল ইবন আবি কুশাইর ও শামওয়াল ইবন যায়দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের নিকট ঠাট্টা ও বিদ্রুপচ্ছলে জিজ্ঞাসা করল যে, আপনি কেয়ামত আগমনের সংবাদ দিয়ে মানুষকে এ ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন- এ ব্যাপারে যদি আপনি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে নির্দিষ্ট করে বলুন, কেয়ামত কোন সালের কত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে তো আমরাও জানি। এ ঘটনার ভিত্তিতেই আয়াতটি নাযিল হয়। [তাবারী] ساعة সময় (ক্ষণ বা মুহূর্ত)এর অর্থে ব্যবহার হয়। কিয়ামত দিবসকে الساعةবলা হয়েছে, যেহেতু তা হঠাৎ এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, ক্ষণিকের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী লন্ডভন্ড হয়ে যাবে। অথবা দ্রুত হিসাব-নিকাশের দিকে লক্ষ্য করে কিয়ামতের সময়কে) الساعةসময়) বলা হয়েছে।তার সত্যিকার জ্ঞান না কোন ফিরিশতার আছে আর না কোন নবীর। আল্লাহ ছাড়া কিয়ামতের সময়জ্ঞান কারো নেই। তিনিই তা যথাসময়ে প্রকাশ করবেন।"আমার আবির্ভাব এবং কেয়ামত এমনভাবে মিশে আছে, যেমন মিশে থাকে হাতের দু'টি আঙ্গুল।" [বুখারীঃ ৬৫০৩-৬৫০৫, মুসলিমঃ ২৯৫০]

৬। নবী (সাঃ) গায়বের খবর জানতেন না। গায়েবের জ্ঞান কেবল মহান আল্লাহর আছে।শুধু ততটুকুই জানেন, যতটুকু আল্লাহ তাদের জানিয়েছেন। আর আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দেয়ার পর সেটা জানাকে আর গায়েবের জ্ঞান বলা যাবে না।ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আমি তো আর কিছুই নই

Sisters Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ২৪তম রুকুর (১৮৯-২০৬) আয়াত ১ম স্লাইড

১। তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়. এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাওয়াকে আদম থেকে সৃষ্টি করার কারণ হচ্ছে, তার কাছে গেলে মন প্রশান্ত হবে। তার সাথে সহজ সম্পর্ক তৈরী হবে, সন্তুষ্টি আসবে। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে যে, তিনি সন্তান-সন্ততিদেরকেও একই উদ্দেশ্যে মানুষকে প্রদান করেছেন। আল্লাহ বলেন, "আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং সৃজন করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহমর্মিতা। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। [সূরা আর-রূম: ২১] মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাস যে, বিপদের সময় আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়। অতএব তারা দু'জন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দেয়।

২। আরবের মুশরিক সম্প্রদায়ের অপরাধ ছিল এই যে, তারা সুস্থ, সবল ও পূর্ণ অবয়ব সম্পন্ন সন্তান জন্মের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করতো কিন্তু সন্তানের জন্মের পর আল্লাহর এ দানে অন্যদেরকে অংশীদার করতো। নিঃসন্দেহে তাদের এ অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু বর্তমানে তাওহীদের দাবীদারদের মধ্যে আমরা যে শির্কের চেহারা দেখছি তা তার চাইতেও খারাপ।

৩। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা করছেন, যার আল্লাহর সাথে মূর্তি, দেব-দেবী ইত্যাদিকে শরীক করে। অথচ তারা সৃষ্ট, মানুষের হাতের তৈরী। তারা কিছুরই মালিক নয়। ক্ষতি কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। উপাসনাকারীদের পক্ষে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও তাদের নেই। বরং এগুলো হচ্ছে, মৃত।এমনকি কেউ তাদের ক্ষতি করতে চাইলেও তারা নিজেদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করতে পারবে না।

৪। মুশরিকদের বাতিল মা'বুদদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের পক্ষে কাউকে সঠিক পথ দেখানো এবং নিজেদের অনুগামী ও পূজারীদেরকে পথের সন্ধান দেয়া তো দূরের কথা, তারা তো কোন পথপ্রদর্শকের অনুসরণ করারও যোগ্যতা রাখে না। এমন কি কোন আহবানকারীর আহবানের জবাব দেবার ক্ষমতাও তাদের নেই। তাদেরকে কেউ ডাকল কি তাদেরকে পিষে ফেলল, সবই তাদের কাছে সমান।

৫। যখন তারা জীবিত ছিল। আর এখন (ওদের মৃত্যুর পর) তোমরা তাদের তুলনায় বেশি 'কামেল' (সাবলম্বী)। কারণ, তারা দেখতে পায় না, তোমরা দেখতে পাও। তারা শুনতে পায় না, তোমরা শুনতে পাও। তারা কারো কথা বুঝতে পারে না, আর তোমরা বুঝতে পার। তারা উত্তর দিতে সক্ষম নয়, তোমরা উত্তরদানে সক্ষম। এখান হতে প্রমাণিত যে, মুশরিকরা যাদের মূর্তি তৈরী করে ইবাদত করত, তারাও আল্লাহর বান্দা মানুষই ছিল।

৬।যদি এগুলো তোমাদের কোন কাজেই না আসে, তোমাদের আহবানেও সাড়া না দেয়, তারা তোমাদের মতই বান্দা বরং তোমরা তাদের থেকেও পরিপূর্ণ, তাহলে কিসের ভিত্তিতে তোমরা তাদের ইবাদত কর? তোমরা ও তোমাদের উপাস্যরা একত্রিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, আমাকে কোন প্রকার অবকাশ দিও না। দেখতে পাবে যে, তোমরা আমার কোন ক্ষতি পৌছাতে সক্ষম নও। [সা'দী]

Sisters' Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ২৪তম রুকুর (১৮৯-২০৬) আয়াত ২য় স্লাইড

৭। তোমাদের বিরোধিতার কোন ভয় আমার এ কারণেই নেই যে, আমার রক্ষাকারী, সাহায্যকারী ও অভিভাবক হলেন আল্লাহ, যিনি আমার উপর কুরআন নাযিল করেছেন।'সালেহীন' অর্থ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ভাষায় সে সমস্ত লোক, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করে না। এতে নবী-রাসূল থেকে শুরু করে সাধারণ সৎকর্মশীল মুসলিম পর্যন্ত সবাই অন্তর্ভুক্ত

৮। আর যদি আপনি তাদেরকে সৎপথে ডাকেন তবে তারা শুনবে না(১) এবং আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে; অথচ তারা দেখে না।

৯। মানুষের (চরিত্র ও কর্মের) উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন।আলোচ্য আয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোত্তম চরিত্রের হেদায়াত দেয়া হয়েছে। [সা'দী] তাতে তিনটি বাক্য রয়েছে।

প্রথম নির্দেশ হচ্ছে, আপনি عفو গ্রহণ করুন। অধিকাংশ তাফসীরকার যে অর্থ নিয়েছেন তা হল এই যে, عفوবলা হয় এমন প্রত্যেকটি কাজকে, যা সহজে কোন রকম আয়াস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে। [ইবন কাসীর] শরীআত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে আপনি সাধারণ মানুষের কাছে সুউচ্চমান দাবী করবেন না; বরং তারা সহজে যে পরিমাণ আমল করতে পারে আপনি তাই গ্রহণ করে নিন। আপনি পাপী-অপরাধীদের ক্ষমা করে দিন।

দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে, আপনি عرفএর নির্দেশ দিন। এখানে العرف শব্দটির অর্থ, সৎকাজ বা পরিচিত কাজ। যে কোন ভাল ও প্রশংসনীয় কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ যেসব লোক আপনার সাথে মন্দ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে, আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে সৎকাজেরও উপদেশ দিতে থাকুন। অর্থাৎ অসদাচরণের বিনিময় সদাচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায়নীতির মাধ্যমেই নয়; বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করুন।

তৃতীয় নির্দেশ হচ্ছে, আপনি জাহেল বা মূখদেরকে উপেক্ষা করুন। যারা জাহেল তাদের কাছ থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন। মর্মার্থ এই যে, আপনি অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের সাথে কল্যাণকর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন এবং একান্ত কোমলতার সাথে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের বিষয় বাতলে দিন।

১০। যদি এহেন মুহুর্তে রোষানল জ্বলে উঠতে দেখা যায়, তবে বুঝবেন শয়তানের পক্ষ থেকেই এমনটি হচ্ছে এবং তার প্রতিকার হল আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া, তার সাহায্য প্রার্থনা করা।

১১। যারা মুত্তাকী তারা নিজেদের মনে কোন শয়তানী প্ররোচনার প্রভাব এবং কোন অসৎ চিন্তার ছোঁয়া অনুভব করতেই সাথে সাথেই সজাগ হয়ে উঠে। তারপর এ পর্যায়ে কোন ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বনে দ্বীনের স্বার্থ রক্ষিত হবে এবং সত্য প্রীতির প্রকৃত দাবী কি তা তারা পরিষ্কার দেখতে পায়। তারা তাওবা করে এবং প্রচুর পরিমাণে সৎকাজ করে। ফলে শয়তান বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

১২। শয়তানরা কাফেরদের বিভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়। অতঃপর (কাফেররা বিভ্রান্তির দিকে যেতে) অথবা শয়তানরা তাদেরকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যেতে কোন প্রকার ত্রুটি করে না। يَقْصِرُونَ لَاএর কর্তা কাফেরগণ ও হতে পারে, আর তাদের ভাই শয়তানরাও হতে পারে।

Sisters' Forum In Islam.com

সুরা আরাফঃ ২৪তম রুকুর (১৮৯-২০৬) আয়াত ৩য় স্লাইড

১৩। নিজ হতে কেন তুমি এসব মু'জিযা পেশ করো না? এর উত্তরে বলা হচ্ছে যে, তুমি বলে দাও, মু'জিযা দেখানো আমার সাধ্যে নেই, আমি তো শুধুমাত্র আল্লাহর অহীর অনুসরণ করি। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই এই কুরআন যা আমার নিকট এসেছে, তা নিজেই এক মহা মু'জিযা। এতে তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের জন্য রয়েছে দলীল-প্রমাণাদি, পথনির্দেশ, অনুগ্রহ ও করুণা। তবে শর্ত হল, তাতে ঈমান আনা চাই।আর হিদায়াত ও রহমত এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে

১৪। ৭ : ২০৪ ٢٠٤ وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

আর যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শুন এবং নিশ্চুপ হয়ে থাক যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।

১৫। আর আপনি আপনার রবকে নিজ মনে স্মরণ করুন সবিনয়ে, সশংকচিত্তে ও অনুচ্চস্বরে, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর উদাসীনদের অন্তভুক্ত হবেন না।(১) স্মরণ করা অর্থ নামাযও এবং অন্যান্য ধরনের স্মরণ করাও। চাই মুখে মুখে বা মনে মনে যে কোনভাবেই তা হোক না কেন। সকাল-সাঁঝ বলতে সুনির্দিষ্টভাবে এ দুটি সময়ও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। আর এ দু' সময়ে আল্লাহর স্মরণ বলতে বুঝানো হয়েছে সকালের ও বিকালের নামাযকে।

১৬। এটি কুরআন মাজীদের প্রথম তিলাঅতের সিজদার স্থান।

যারা আল্লাহর কাছে রয়েছেন তারা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করা ও রবের বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া শয়তানের কাজ। এর ফল হয় অধঃপতন ও অবনতি। পক্ষান্তরে আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়া এবং তাঁর বন্দেগীতে অবিচল থাকা একটি ফেরেশতাসুলভ কাজ। এর ফল হয় উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ। যদি তোমরা এ উন্নতি চাও তাহলে নিজেদের কর্মনীতিকে শয়তানের পরিবর্তে ফেরেশতাদের কর্মনীতির অনুরূপ করে গড়ে তোল। কুরআন মাজীদের সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে অথবা শুনলে তকবীর দিয়ে একটি সিজদাহ করা এবং তকবীর দিয়ে মাথা তোলা মুস্তাহাব।মহানবী (সাঃ) বলেন, ''আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদাহ করে, তখন শয়তান দূরে সরে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বলে, 'হায় ধ্বংস আমার! ও সিজদাহ করতে আদেশ পেয়ে সিজদাহ করে, ফলে ওর জন্য রয়েছে জান্নাত। আর আমি সিজদার আদেশ পেয়ে তা অমান্য করেছি, ফলে আমার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।'' (আহমাদ, মুসলিম ৮৯৫নং, ইবনে মাজাহ) তিলাঅতের সিজদার জন্য ওযূ শর্ত নয়।

Sisters' Forum In Islam.com

Sisters' Forum In Islam.com

সূরা আরাফ সমাপ্ত

সূরা আনফালঃ আয়াত সংখ্যাঃ ৭৫, রুকুঃ ১০

নাযিল হওয়ার স্থানঃ এ সূরা সর্বসম্মতভাবে মাদানী সূরা।

নামকরণঃ এ সূরার নাম সূরা আল-আনফাল; কারণ সূরার প্রথম আয়াতেই এ শব্দটির উল্লেখ আছে, যার অর্থ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। এর অধিকাংশ বর্ণনা এ সংক্রান্ত। কেউ কেউ এটাকে সূরা বদরও নাম দিয়েছেন। [বুখারীঃ ৪৮৮২] কারণ, অধিকাংশ আলোচনা ছিল বদর যুদ্ধের। আবার কেউ কেউ এ সূরাকে সূরা 'জিহাদ' নামেও অভিহিত করেছেন।

নাযিল হওয়ার সময়কালঃ সূরা আল-আনফাল সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। [বুখারীঃ ৪৬৪৫, মুসলিমঃ ৩০৩১]। সে হিসেবে এই সূরা ২য় হিজরী সনে বদর যুদ্ধের পরেই নাযিল হয়েছে।
ইসলাম ও কুফরের মধ্যে সংঘটিত এ প্রথম যুদ্ধের ওপর এতে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূরার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমান করা যায়, সম্ভবত এ সমগ্র সূরাটি একটি মাত্র ভাষনের অন্তর্ভুক্ত এবং একই সঙ্গে এ ভাষণটি নাযিল করা হয়। তবে এর কোন কোন আয়াত বদর যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পরে নাযিল হয়ে থাকতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে ভাষণের ধারাবাহিকতায় এগুলোকে উপযুক্ত স্থানে রেখে, এ সমগ্র ভাষণটিকে একটি ধারাবাহিক ভাষণের রূপ দান করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরাটি পর্যালোচনা করার আগে বদরের যুদ্ধ এবং তার সাথে সম্পর্কিত অবস্থা ও ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।নবী (সা.) তাঁর দাওয়াতের প্রথম দশ-বারো বছর মক্কা মুয়াযময়ায় অবস্থান করেছিলেন। এ সময় তাঁর দাওয়াত যথেষ্ট পরিপক্কতা ও স্থিতিশীলতা অর্জন করেছিল। কারণ এর পেছনে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহী উন্নত চরিত্র ও বিশাল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী এক জ্ঞানী পুরুষ। তিনি নিজের ব্যক্তিসত্তার সমস্ত যোগ্যতা ও সামর্থ্য এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর কার্যধারা থেকে এ সত্যটি পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, এ আন্দোলনকে তার সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প।

Sisters'Forum In Islam.com

অন্যদিকে এ দাওয়াতের মধ্যে ছিল এমন এক অদ্ভুত ও তীব্র আকর্ষণী ক্ষমতা যে, হৃদয়-মস্তিষ্কের গভীরে তার অনুপ্রবেশ কার্য চলছিল দ্রুত ও অপ্রতিহত গতিতে। মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার এবং হিংসা ও সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতির প্রাচীন তার পথ রোধ করতে পারছিল না। এ কারণে আরবের প্রাচীন জাহেলী ব্যবস্থার সমর্থক শ্রেণী প্রথম দিকে একে হালকাভাবে এবং অবজ্ঞার চোখে দেখলেও মক্কী যুগের শেষের দিকে একে একটি গুরুতর বিপদ বলে মনে করেছিল। একে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা নিজেদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তখনো পর্যন্ত এ দাওয়াতের মধ্যে কোন কোন দিক দিয়ে বেশ কিছুটা অভাব রয়ে গিয়েছিল।

১। যদিও মক্কার ইসলামের অনুসারীরা কুরাইশদের জুলুম-নির্যাতন বরদাশত করে নিজেদের ঈমানের অবিচলতা ও নিষ্ঠা এবং ইসলামের সাথে তাদের অটুট সম্পর্কের পক্ষে বেশ বড় আকারের প্রমাণ পেশ করেছিল, তবুও একথা প্রমাণিত হওয়া তখনো বাকী ছিল যে, ইসলামী আন্দোলন এমন একদল উৎসর্গীত প্রাণ অনুসারী পেয়ে গেছে যারা নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মোকাবিলায় অন্য কোন জিনিসকেই প্রিয়তর মনে করে না। বস্তুত একথা প্রমাণ করার জন্য তখনো অনেক পরীক্ষারও প্রয়োজন ছিল।

২। এ দাওয়াতের আওয়াজ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়লেও এর প্রভাবগুলো ছিল চারদিকে বিক্ষিপ্ত ও অসংহত। এ দাওয়াত যে জনশক্তি সংগ্রহ করেছিল তা এলোমেলো অবস্থায় সারাদেশে ছড়িয়ে ছিল। পুরাতন জাহেলী ব্যবস্থার সাথে চূড়ান্ত মোকাবিলা করার জন্য যে ধরনের সামষ্টিক শক্তির প্রয়োজন ছিল, তা সে তখনো অর্জন করেনি।

৩। এ দাওয়াত তখনো মাটিতে কোথাও শিকড় গাড়তে পারেনি। তখনো তা কেবল বাতাসেই উড়ে বেড়াচ্ছিল। দেশের অভ্যন্তরে এমন কোন এলাকা ছিল না যেখানে দৃঢ়পদ হয়ে নিজের ভূমিকাকে সুসংহত করে সে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারতো।

৪। এ দাওয়াতের বানী বাহক ও তার অনুসারীরা যে জিনিসের দিকে সমগ্র দুনিয়াবাসীকে আহবান জানিয়ে আসছিলেন তাকে কার্যকর করার ব্যাপারে তারা নিজেরা কতটুকু নিষ্ঠাবান, এখনো কোন পরীক্ষার মানদণ্ডে যাচাই বাছাই করার পর তার সুস্পষ্ট চেহারাও সামনে আসেনি।

মক্কী যুগের শেষ তিন-চার বছরে ইয়াসরেবে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে অপ্রতিহত গতিতে। সেখানকার লোকেরা আরবের অন্যান্য এলাকার গোত্রগুলোর তুলনায় অধিকতর সহজে ও নির্দ্বিধায় এ আলো গ্রহণ করতে থাকে।

শেষে নবুয়াতের দ্বাদশ বছরে হজ্জের সময় ৭৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল রাতের আঁধারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলো। তারা কেবল ইসলাম গ্রহণই করেননি বরং তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে নিজেদের শহরে স্থান দেয়ারও আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসের একটি বৈপ্লবিক পটপরিবর্তন।

মহান আল্লাহ তাঁর নিজ অনুগ্রহে এ দুর্লভ সুযোগটি দিয়েছিলেন এবং নবী (সা.) ও হাত বাড়িয়ে তা লুফে নিয়েছিলেন। ইয়াসরেববাসীরা নবী(সা.) কে শুধুমাত্র একজন শরণার্থী হিসেবে নয় বরং আল্লাহর প্রতিনিধি এবং নেতা ও শাসক হিসেবেও আহবান করেছিলেন।

আর তাঁর অনুসারীদেরকে তারা একটি অপরিচিতি দেশে নিছক মুহাজির হিসেবে বসবাস করার জন্য আহবান জানাচ্ছিলেন না। বরং আরবের বিভিন্ন এলাকায় ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যেসব মুসলমান ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তাদের সবাইকে ইয়াসরেবে জমা করে ইয়াসরেবী মুসলমানদের সাথে মিলে একটি সুসংবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এভাবে মূলত ইয়াসরেব নিজেকে "মদীনাতুল ইসলাম" তথা ইসলামের নগর হিসেবে উপস্থাপিত করলো। নবী(সা.) তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে সেখানে আরবের প্রথম দারুল ইসলাম গড়ে তুললেন।

Sisters'Forum In Islam.com

এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের অর্থ কি হতে পারে সে সম্পর্কে মদীনাবাসীরা অনবহিত ছিল না। এর পরিষ্কার অর্থ ছিল, একটি ছোট্ট শহর সারাদেশের উদ্যত তরবারি এবং সমগ্র দেশবাসীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক বয়কটের মোকাবিলায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কাজেই আকাবার বাইআত গ্রহণ করার সময় সেদিনের সেই রাত্রীকালীন মজলিসে ইসলামের প্রাথমিক সাহায্যকারী (আনসারগণ) এ পরিণাম সম্পর্কে পুরোপুরি জেনে বুঝেই নবী (সা.) এর হাতে নিজেদের হাত রেখেছিলেন। যখন এ বাইআত অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ঠিক তখনই ইয়াসরেবী প্রতিনিধি দলের সর্বকনিষ্ঠ যুব সদস্য আস'আদ ইবনে যুরারাহ (রা.) উঠে বললেনঃ থামো, হে ইয়াসরেব বাসীরা! আমরা একথা জেনে বুঝেই এঁর কাছে এসেছি যে, ইনি আল্লাহর রসূল এবং আজ এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে সমগ্র আরববাসীর শত্রুতার ঝুঁকি নেয়া। এর ফলে তোমাদের শিশু সন্তানদেরকে হত্যার করা হবে এবং তোমাদের ওপর তরবারি বর্ষিত হবে। কাজেই যদি তোমাদের এ আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা থাকে তাহলে এঁর দায়িত্ব গ্রহণ করো। আল্লাহ এর প্রতিদান দেবেন। আর যদি তোমরা নিজেদের প্রাণকে প্রিয়তর মনে করে থাকো তাহলে দায়িত্ব ছেড়ে দাও এবং পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অক্ষমতা জানিয়ে দাও। কারণ এ সময় অক্ষমতা প্রকাশ করা আল্লাহর কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হতে পারে''।

প্রতিনিধি দলের আর একজন সদস্য আব্বাস ইবনে উবাদাহ ইবনে নাদলাহ (রা.) একথারই পুনরাবৃত্তি করেন এভাবেঃ

তোমরা কি জানো, এ ব্যক্তির হাতে কিসের বাইআত করছো? (ধ্বনিঃ হাঁ আমরা জানি) তোমরা এঁর হাতে বাইআত করে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ঝুঁকি নিচ্ছো।কাজেই যদি তোমরা মনে করে থাকো, যখন তোমাদের ধন-সম্পদ ধ্বংসের মুখোমুখি হবে এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হবার আশংকা দেখা দেবে তখন তোমরা এঁকে শত্রুদের হাতে সোপর্দ করে দেবে, তাহলে আজই বরং এঁকে ত্যাগ করাই ভাল। কারণ আল্লাহর কসম, এটা দুনিয়ায় ও আখেরাতের সবখানেই লাঞ্চনার কারণ হবে। আর যদি তোমরা মনে করে থাকো, এ ব্যক্তিকে তোমরা যে, আহবান জানাচ্ছো, নিজেদের ধন-সম্পদ ধ্বংস ও নেতৃস্থানীয় লোকেদের জীবন নাশ সত্ত্বেও তোমরা তা পালন করতে প্রস্তুত থাকবে, তাহলে অবশ্যি তাঁর হাতে আঁকড়ে ধরো। কারণ আল্লাহর কসম, এরই মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ''।

একথায় প্রতিনিধি দলের সবাই এক বাক্যে বলে উঠলেনঃ

''আমরা এঁকে গ্রহণ করে আমাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করতে ও নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হবার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত''।

এ ঘটনার পর সেই ঐতিহাসিক বাইআত অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে একে আকাবার দ্বিতীয় বাইআত বলা হয়।

আকাবার প্রথম শপথ বলতে বুঝায় ৬২১ খ্রিষ্টাব্দে মদিনা থেকে আসা একদল সাহাবার ইসলামের উপর অটল এবং ইসলাম প্রচারের কাজে সাহায্য করার শপথ নেওয়া ।

Sisters' Forum In Islam.com

মদীনার মত জায়গায় এই মুসলিম শক্তির একত্র সমাবেশ কুরাইশদের জন্য আরো নতুন বিপদের সংকেত দিচ্ছিল। কারণ লোহিত সাগরের কিনারা ধরে ইয়ামন থেকে সিরিয়ার দিকে যে বাণিজ্য পথটি চলে গিয়েছিল তার সংরক্ষিত ও নিরাপদ থাকার ওপর কুরাইশ ও অন্যান্য বড় বড় গোত্রের অর্থনৈতিক জীবন নির্ভরশীল ছিল। আর এটি এখন মুসলমানদের প্রভাবাধীনে চলে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত। এ প্রধান বাণিজ্য পথটি দখল করে মুসলমানরা জাহেলী ব্যবস্থার জীবন ধারণ দুর্বিষহ করে তূলতে পারতো। এ প্রধান বাণিজ্য পথের ভিত্তিতে শুধু মাত্র মক্কাবাসীদের যে ব্যবসায় চলতো তার পরিমাণ ছিল বছরে আড়াই লাখ আশরাফী। তায়েফ ও অন্যান্য স্থানের ব্যবসায় ছিল এর বাইরে।

কুরাইশরা এ পরিণতির কথা ভালভাবেই জানতো। যে রাতে আকাবার বাইআত অনুষ্ঠিত হলো সে রাতেই এ ঘটনার উড়ো খবর মক্কাবাসীদের কানে পৌঁছে গেলো। আর সাথে সাথেই সেখানে হৈ চৈ শুরু হয় গেলো। প্রথমে তারা চেষ্টা করলো মদীনাবাসীদেরকে নবী (সা.) এর দল থেকে ভাগিয়ে নিতে। তারপর যখন মুসলমানরা একজন দুজন করে মদিনায় হিজরত করতে থাকলো এবং কুরাইশদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেলো যে, এখন মুহাম্মাদ (সা.) সেখানে স্থানান্তরিত হয়ে যাবেন তখন তারা এ বিপদকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য সর্বশেষ উপায় অবলম্বনে এগিয়ে এলো।

রসূলের (সা.) হিজরতের মাত্র কয়েক দিন আগে কুরাইশদের পরামর্শ সভা বসলো। অনেক আলোচনা পর্যালোচনার পর সেখানে স্থির হলো, বনী হাশেম ছাড়া কুরাইশদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে লোক বাচাই করা হবে এবং এরা সবাই মিলে মুহাম্মাদ (সা., কে হত্যা করবে। এর ফলে বনী হাশেমের জন্য এ সমস্ত গোত্রের সাথে একাকী লড়াই করা কঠিন হবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে তারা প্রতিশোধের পরিবর্তে রক্ত মূল্য গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

আল্লাহর মেহেরবানী এবং নবী (সা.) এর আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ও উন্নত কৌশল অবলম্বনের কারণে তাদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেলো। ফলে রসূলুল্লাহ (সা., নির্বিঘ্নে মদীনায় পৌঁছে গেলেন।

এভাবে হিজরত প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়ে কুরাইশরা মদীনার সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কে (যাকে হিজরতের আগে মদীনাবাসীরা নিজেদের বাদশাহ বানাবার প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং রসূলের মদীনায় পৌঁছে যাবার এবং আওস ও খাযরাজদের অধিকাংশের ইসলাম গ্রহণের ফলে যার বাড়া ভাতে ছাই পড়ে গিয়েছিল) পত্র লিখলোঃ তোমরা আমাদের লোককে তোমাদের ওখানে আশ্রয় দিয়েছো। আমরা এ মর্মে আল্লাহর কসম খেয়েছি, হয় তোমরা তার সাথে লড়বে বা তাকে সেখান থেকে বের করে দেবে। অন্যথায় আমরা সবাই মিলে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা ও মেয়েদেরকে বাদী বানাবো। কুরাইশদের এ উস্কানির মুখে আবুদুল্লাহ ইবনে উবাই কিছু দুষ্কর্ম করার চক্রান্ত এঁটেছিল।কিন্তু সময় মত নবী (সা.) তার দুষ্কর্ম রুখে দিলেন।

মদীনার প্রধান সাদ ইবনে মুআয উমরাহ করার জন্য মক্কা গেলেন। সেখানে হারম শরীফের দরজার ওপর আবু জেহেল তার সমালোচনা করলো।

বায়তুল্লাহ যিয়ারত করার পথ মুসলমানদের জন্য বন্ধ। আর এর জবাবে মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে বলা হলো, সিরিয়ার সাথে বাণিজ্য করার পথ ইসলাম বিরোধীদের জন্য বিপদসংকুল।

Sisters'Forum In Islam.com

আসলে সে সময় মুসলমানদের জন্য উল্লেখিত বাণিজ্য পথের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব মজবুত করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় ছিল না। কারণ এ পথের সাথে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রগুলোর স্বার্থ বিজড়িত ছিল। ফলে এর ওপর মুসলমানদের কৃতিত্ব বেশী মজবুত হলে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে নিজেদের শত্রুতামূলক নীতি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হতে পারে বলে আশা করা যায়। কাজেই মদীনায় পৌছার সাথে সাথেই নবী (সা.) সদ্যজাত ইসলামী সমাজে প্রাথমিক নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধান ও মদীনার ইহুদী অধিবাসীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করার পর সর্বপ্রথম এ বাণিজ্য পথটির প্রতি নজর দিলেন। এ ব্যাপারে তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন।

প্রথমত মদীনা ও লোহিত সাগরের উপকূলের মধ্যবর্তীস্থলে এ বাণিজ্য পথের আশেপাশে যেসব গোত্রের বসতি ছিল তাদের সাথে তিনি আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিলেন। এভাবে তাদেরকে সহযোগিতামূলক মৈত্রী অথবা কমপক্ষে নিরপেক্ষতার চুক্তিতে আবদ্ধ করা ছিল মূল উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ সফলতা লাভ করলেন। জুহাইনা গোত্র, বনী যামরার, বনী মুদলিজ-ইসলাম প্রচারের ফলে এ গোত্রগুলোতে ইসলামের সমর্থক ও অনুসারীদের একটি বিরাট গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত কুরাইশদের সওদাগরী কাফেলাগুলোকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য বাণিজ্য পথের ওপর একের পর এক ছোট ছোট ঝটিকা বাহিনী পাঠাতে থাকলেন। কোন কোন ঝাটিকা বাহিনীর সাথে তিনি নিজেও গেলেন। প্রথম বছর এ ধরনের ৪ টি বাহিনী পাঠানো হলো। মাগাযী (যুদ্ধ ইতিহাস) গ্রন্থগুলো এগুলোকে সারীয় হামযা, সারীয়া, উবাইদা ইবনে হারেস, সারীয়া সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও গাযওয়াতুল আবওয়া নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ সমস্ত অভিযানের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

এক, এ অভিযানগুলোয় কোন রক্তপাতের ঘটনা ঘটেনি এবং কোন কাফেলা লুণ্ঠিতও হয়নি। এ থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর মাধ্যমে কুরাইশদেরকে বাতাসের গতি কোন দিকে তা জানিয়ে দেয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

দুই, এর মধ্য থেকে কোন একটি বাহিনীতেও নবী (সা.) মদীনার একটি লোককেও শামিল করেননি। মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদেরকেই তিনি এসব বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেন।কারণ এর ফলে যদি সংঘর্ষ বাধে তাহলে তা যেন এর সাথে চড়িয়ে পড়ে এ আগুনকে চারদিকে ছাড়িয়ে না দেয়।

মক্কাবাসীরাও মদীনার দিকে লুটেরা বাহিনী পাঠাতে থাকে। তাদেরই একটি বাহিনী কুরয ইবনে জাবের আল ফিহরীর নেতৃত্বে একেবারে মদীনার কাছাকাছি এলাকায় হামলা চালিয়ে মদীনাবাসীদের গৃহপালিত পশু লুট করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে কুরাইশরা এ সংঘর্ষের মধ্যে অন্যান্য গোত্রদেরকেও জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া তারা কেবল ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছিল না, লুটতরাজও শুরু করে দিয়েছিল

এ অবস্থায় ২য় হিজরীর শাবান মাসে কুরাইশদের একটি বিরাট বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কার পথে অগ্রসর হয়ে এমন এক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যে জায়গাটি ছিল মদীনাবাসীদের আওতার মধ্য। এ কাফেলার সাথে ছিল প্রায় ৫০ হাজার আশরাফীর সামগ্রী। তাদের সাথে তিরিশ চল্লিশ জনের বেশী রক্ষী ছিল না। যেহেতু পণ্যসামগ্রী ছিল বেশী এবং রক্ষীর সংখ্যা ছিল কম আর আগের অবস্থার কারণে মুসলমানদের কোন শক্তিশালী দলের তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করার আশংকা ছিল অত্যন্ত প্রবল, তাই কাফেলা সরদার আবু সুফিয়ান এ বিপদসংকুল স্থানে পৌঁছেই সাহায্য আনার জন্য কোন এক ব্যক্তিকে মক্কা অভিমুখে পাঠিয়ে দিল। লোকটি মক্কায় পৌঁছেই প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী নিজের উটের কান কেটে ফেললো, তার নাক চিরে দিল, উটের পিঠের আসন উল্টে দিলে এবং নিজের জামা সামনের দিকে ও পিছনের দিকে ছিড়ে ফেলে এই বলে চিৎকার করতে থাকলোঃ

Sisters' Forum In Islam.com

এ ঘোষণা শুনে সারা মক্কার বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেলো। কুরাইশদের বড় বড় সরদাররাই সবাই যুদ্ধের জন্য তৈরী হলো।
প্রায় এক হাজার যোদ্ধা রণসাজে সজ্জিত হয়ে পূর্ণ আড়ম্বর ও জাঁক-জমকের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রওয়ানা হলো। তাদের মধ্যে ছিল ৬শ বর্মধারী এবং একশ জন অশ্বারোহী। নিজেদের কাফেলাকে শুধু নিরাপদে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসাই তাদের কাজ ছিল না বরং এই সংগে তারা নিত্য দিনের এ আশংকা ও আতংক বোধকে চিরতরে খতম করে দিতে চাচ্ছিল। মদীনায় এ বিরোধী শক্তির নতুন সংযোজনকে তারা গুড়িয়ে দিতে এবং এর আশপাশের গোত্রগুলোকে এর দূর সন্ত্রস্ত করে তুলতে চাচ্ছিল যার ফলে ভবিষ্যতে এ বাণিজ্য পথটি তাদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যায়।
মক্কা থেকে হিজরত করে এ নতুন শহরে আসার পর এখনো দু'টি বছরও পার হয়ে যায়নি। মুহাজিররা বিত্ত ও সরঞ্জামহীন, আনসাররা অনভিজ্ঞ, ইহুদী গোত্রগুলো বিরুদ্ধবাদিতায় মুখর খোদ মদীনাতেই মুনাফিক ও মুশরিকদের একটি বিরাট গোষ্ঠী উপস্থিত এবং চারপাশের সমস্ত গোত্র কুরাইশদের ভয়ে ভীত। আর সেই সঙ্গে ধর্মীয় দিক দিয়েও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এ অবস্থায় যদি কুরাইশরা মদীনা আক্রমণ করে, তাহলে মুসলমানদের এ ক্ষুদ্র দলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি তারা মদীনা আক্রমণ না করে শুধুমাত্র নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করে বাণিজ্য কাফেলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় এবং মুসলমানরা দমে গিয়ে ঘরের কোনে-হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে, তাহলেও সহসাই মুসলমানদের প্রতিপত্তি এমনভাবে আহত হবে এবং তাদের প্রভাব এত বেশী ক্ষুন্ন হবে, যার ফলে আরবের প্রতিটি শিশুও তাদের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। সারা দেশে তাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না। তখন চারপাশের সমস্ত গোত্র কুরাইশদের ইঙ্গিতে কাজ করতে থাকবে। মদীনার ইহুদী, মুনাফিক ও মুশরিকরা প্রকাশ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। মদীনায় জীবন ধারণ করাও সে সময় দুঃসাধ্য হয় পড়বে। মুসলমানদের কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকবে না। ফলে তাদের ধন-প্রাণ-ইজ্জত-আব্রুর উপর আক্রমণ চালাতে কেউ ইতস্তত করবেনা। এ কারণে নবী (সা.) দৃঢ় সংকল্প নিলেন যে, বর্তমানে যতটুকু শক্তি-সামর্থ্য আমাদের আছে তাই নিয়েই আমরা বের হয়ে পড়বো। দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকার ও টিকে থাকার ক্ষমতা কার আছে এবং কার নেই ময়দানেই তার ফায়সালা হয়ে যাবে।
এ চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবার সংকল্প করেই তিনি আনসার ও মোহাজিরদের একত্র করলেন। তাদের সামনে পরিস্থিতি পরিষ্কার তুলে ধরলেন। তাদের সামনে পরিস্থিতি পরিষ্কার তুলে ধরলেন। একদিকে উত্তরে বাণিজ্য কাফেলা এবং অন্যদিকে দক্ষিণে এগিয়ে আসছে কুরাইশদের সেনাদল। আল্লাহর ওয়াদা, এ দু'টির মধ্য থেকে কোন একটি তোমরা পেয়ে যাবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ বলো, এর মধ্য থেকে কার মোকাবিলায় তোমরা এগিয়ে যেতে চাও? জবাবে বিপুল সংখ্যক সাহাবী মত প্রকাশ করলেন, কাফেলার ওপর আক্রমণ চালানো হোক। কিন্তু নবী (সা.) এর সামনে ছিল অন্য কিছু অভিপ্রায়। তাই তিনি নিজের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। একথায় মোহাজিরদের মধ্য থেকে মিকদাদ ইবনে আমর (রা.) উঠে বললেনঃহে আল্লাহর রসূল! আপনার রব আপনাকে যেদিকে যাবার হুকুম দিচ্ছেন সেদিকে চলুন। আপনি যেদিকে যাবেন আমরা আপনার সাথে আছি। আমরা বনী ইসরাঈলের মত একথা বলবো নাঃ যাও, তুমি ও তোমার আল্লাহ দু'জনে লড়াই করো, আমরা তো এখানেই বসে রইলাম। বরং আমরা বলছিঃ চলুন আপনি ও আপনার আল্লাহ দু'জনে লড়ুন আর আমরাও আপনাদের সাথে জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করবো। যতক্ষণ আমাদের একটি চোখের তারাও নড়াচড়া করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত।
কিন্তু আনসারদের মতামত না জেনে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। কারণ এ পর্যন্ত যেসব সামরিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল তাতে তাদের সাহায্য গ্রহণ করা হয়নি এবং প্রথম দিন তারা ইসলামকে সমর্থন করার যে শপথ নিয়েছিল তাকে কার্যকর করতে তারা কতটুকু প্রস্তুত তা পরীক্ষা করার এটি ছিল প্রথম সুযোগ। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সা.) সরাসরি তাদেরকে সম্বোধন না করে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। একথায় সা'দ ইবনে মু'আয উঠে বললেন, সম্ভবত আপনি আমাদের সম্বোধন করে বলছেন? জবাব দিলেনঃ হাঁ। একথা শুনে সা'দ বললেনঃ

Sisters'Forum In Islam.com

“আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি। আপনি যা কিছু এনেছেন তাকে সত্য বলে ঘোষণা করেছি। আপনার কথা শুনার ও আপনার আনুগত্য করার দৃঢ় শপথ নিয়েছি। কাজেই হে আল্লাহর রসূল! আপনি যা সংকল্প করেছেন তা করে ফেলুন। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন তাহলে আমরাও আপনার সাথে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের একজনও পিছনে পড়ে থাকবে না। আপনি কালই আমাদের দুশমনের সাথে যুদ্ধ শুরু করুন। এটা আমাদের কাছে মোটেই অপছন্দনীয় নয়। আমরা যুদ্ধে অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকবো। মোকাবিলায় আমরা সত্যিকার প্রাণ উৎসর্গীতার প্রমাণ দেবো। সম্ভবত আল্লাহ আমাদের থেকে আপনাকে এমন কিছু কৃতিত্ব দেখিয়ে দেবেন, যাতে আপনার চোখ শীতল হবে। কাজেই আল্লাহর বরকতের ভরসায় আপনি আমাদের নিয়ে চলুন।"

এ আলোচনা ও বক্তৃতার পরে সিদ্ধান্ত হলো, বাণিজ্য কাফেলার পরিবর্তে কুরাইশ সেনা দলের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এটা কোন যেনতেন সিদ্ধান্ত ছিল না। এ সংক্ষিপ্ত সময়ে যারা যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন, তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ’র কিছু বেশী (৮৬ জন মোহাজির, ৬১ আওস গোত্রের এবং ১৭০ জন খাযরাজ গোত্রের, । এদের মধ্যে মাত্র দু’তিন জনের কাছে ঘোড়া ছিল। আর বাকি লোকদের জন্য ৭০ টির বেশী উট ছিল না। এগুলোর পিঠে তারা তিন চারজন করে পালাক্রমে সওয়ার হচ্ছিলেন। যুদ্ধাস্ত্রও ছিল একেবারেই অপ্রতুল। মাত্র ৬০ জনের কাছে বর্ম ছিল। এ কারণে গুটিকয় উৎসর্গীত প্রাণ মুজাহিদ ছাড়া এ ভয়ংকর অভিযানে শরীক অধিকাংশ মুজাহিদই হৃদয়ে উৎকণ্ঠা অনুভব করছিলেন। তারা মনে করছিলেন, যেন তারা জেনে বুঝে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন।

নবী ও সাচ্চা-সত্যনিষ্ঠা মুমিনগণ একথা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, এটিই প্রাণ উৎসর্গ করার সময়। তাই আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাঁরা বের হয়ে পড়েছিলেন। তারা সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলেন। এ পথেই কুরাইশদের বাহিনী মক্কা থেকে ধেয়ে আসছিল। অথচ শুরুতে যদি বাণিজ্য কাফেলা লুট করার ইচ্ছা থাকতো, তাহলে উত্তর পশ্চিমের পথে এগিয়ে যাওয়া হতো।

রমযান মাসের ১৭ তারিখে বদর নামক স্থানে উভয় পক্ষের মোকাবিলা হলো। নবী (সা.) দেখলেন, তিনজন কাফেরের মোকাবিলায় একজন মুসলমান দাঁড়িয়েছে এবং তাও আবার তারা পুরোপুরি অস্ত্র সজ্জিত নয়। এ অবস্থা দেখে তিনি আল্লাহর সামনে দোয়া করার জন্য দু হাত বাড়িয়ে দিলেন। অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে ও কান্না বিজড়িত স্বরে তিনি দোয়া করতে থাকলেনঃ “হে আল্লাহ! এই কুরাইশরা এসেছে, তাদের সকল ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা নিয়ে তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করতে। হে আল্লাহ! এখন তোমার সেই সাহায্য এসে যাওয়া দরকার, যার ওয়াদা তুমি করেছিলে আমার সাথে। হে আল্লাহ! যদি আজ এ মুষ্টিমেয় দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে এ পৃথিবীতে আর কোথাও তোমার ইবাদত করার মত কেউ থাকবে না।“

এ যুদ্ধের ময়দানে মক্কার মোহাজিরদের পরীক্ষা ছিল সবচেয়ে কঠিন। তাদের আপন ভাই-চাচা ইত্যাদি তাদের বিরুদ্ধে ময়দানে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এ ধরনের কঠিন পরীক্ষায় একমাত্র তারাই উত্তীর্ণ হতে পারে, যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে হক ও সত্যের সাথে সম্পর্ক জুড়েছ এবং মিথ্যা ও বাতিলের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে পুরোপুরি উদ্যোগী হয়েছে। ওদিকে আনসারদের পরীক্ষাও কিছু কম ছিল না। এতদিন তারা মুসলমানদেরকে শুধুমাত্র আশ্রয় দিয়ে কুরাইশ ও তাদের সহযোগী গোত্রগুলোর শত্রুতার ঝুঁকি নিয়েছিল। কিন্তু এবার তো তারা ইসলামের সমর্থনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিল। এর মানে ছিল, কয়েক হাজার লোকের একটি জনবসতি সমগ্র আরব দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। এ ধরনের দুঃসাহস একমাত্র তারাই করতে পারে, যারা সত্য আদর্শের ওপর ঈমান এনে তার জন্য নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে পুরোপুরি জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হতে পারে। অবশেষে তাদের অবিচল ঈমান ও সত্যনিষ্ঠা আল্লাহর সাহায্যের পুরস্কার লাভে সফল হয়ে গেলো।

আর নিজেদের সমস্ত অহংকার ও শক্তির অহমিকা সত্ত্বেও কুরাইশরা এ সহায়-সম্বলহীন, জানবাজ সৈনিকদের হাতে পরাজিত হয়ে গেলো। তাদের ৭০ জন নিহত হলো, ৭০ জন বন্দী হলো এবং তাদের সাজ-সরঞ্জামগুলো গনীমতের সামগ্রী হিসেবে মুসলমানদের দখলে এলো। কুরাইশদের যেসব বড় বড় সরদার তাদের মজলিস গুলজার করে বেড়াতো এবং ইসলাম বিরোধী আন্দোলনে যারা সর্বক্ষণ তৎপর থাকতো, তারা এ যুদ্ধে নিহত হলো। এ চূড়ান্ত বিজয় আরবে ইসলামকে একটি উল্লেখযোগ্য শক্তিতে পরিণত করলো। একজন পাশ্চাত্য গবেষক লিখেছেন, “বদর যুদ্ধের আগে ইসলাম ছিল শুধুমাত্র একটি ধর্ম ও রাষ্ট্র। কিন্তু বদর যুদ্ধের পরে তা রাষ্ট্রীয় ধর্মে বরং নিজেই রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গেলো।"

Sisters'Forum In Islam.com

আলোচ্য বিষয়

কুরআনের এ সূরাটিতে এ ঐতিহাসিক যুদ্ধের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা যুদ্ধ জয়ের পর যেভাবে নিজেদের সেনাবাহিনীর পর্যালোচনা করে থাকেন, এ পর্যালোচনার ধারাটি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

- মুসলমানরা যাতে তাদের নৈতিক ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে, সে উদ্দেশ্যে এখানে সর্বপ্রথম সে সব নৈতিক ত্রুটি নির্দেশ করা হয়েছে। যেগুলো তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান ছিল।
- বদর যুদ্ধের এ বিজয়ে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন কি পরিমাণ ছিল তা উল্লেখ করে জানানো হয়েছে যে, তারা নিজেদের সাহসিকতা ও শৌর্য-বীর্যের মিথ্যা গরীমায় স্ফীত না হয়ে বরং এ থেকে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।
- এরপর যে নৈতিক উদ্দশ্যে মুসলমানদের হক ও বাতিলের এ সংঘাত সৃষ্টি করতে হবে তা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। এই সঙ্গে এ সংঘাতে যেসব নৈতিক গুণের সাহায্যে তারা সাফল্য লাভ করতে পারে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- তারপর মুনাফিক, মুশরিক ও ইহুদিদের এবং এ যুদ্ধে বন্দি অবস্থায় আনীত লোকদের সম্বোধন করে অত্যন্ত শিক্ষণীয় বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।
- অতঃপর যুদ্ধের ফলে যেসব সম্পদ দখলে এসেছিল, সেগুলো সম্পর্কে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেগুলোকে যেন তারা নিজেদের নয় বরং আল্লাহর সম্পদ মনেকরে আল্লাহ তার মধ্য থেকে তাদের জন্য যতটুকু অংশ নির্ধারিত করেছেন ঠিক ততটুকুই যেন তারা কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করে নেয় এবং আল্লাহ নিজের কাজের জন্য এবং নিজের গরীব বান্দাদের সাহায্য করার জন্য যতটুকু অংশ নির্দিষ্ট করেছেন, সন্তোষ ও আগ্রহ সহকারে যেন তা মেনে নেয়।
- এরপর যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে কতিপয় নৈতিক বিধান দেওয়া হয়েছে। ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে এগুলো ছিল একান্ত জরুরী। এর মাধ্যমে নিজেদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ধির ক্ষেত্রে মুসলমানরা জাহেলী পদ্ধতি থেকে দূরে থাকতে পারবে এবং দুনিয়ার ওপর তাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।
- এ সঙ্গে সারা দুনিয়াবাসী একথা জানতে সক্ষম হবে যে, ইসলাম তার আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকেই নৈতিকতার ওপর বাস্তব জীবনের ভিত কায়েম করার যে দাওয়াত দিয়ে আসছে, তার নিজের বাস্তব জীবনেই সে যথার্থই তা কার্যকর করেছে।

সবশেষে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইনের কতিপয় ধারা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে দারুল ইসলামের মুসলমান অধিবাসীদের আইনগত মর্যাদা, দারুল ইসলামের সীমানার বাইরে অবস্থানকারী মুসলমানদের থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে।

Sisters'Forum In Islam.com

সুরা আনফাল ১ম রুকু (১-১০) আয়াত

১। أنفال نفل শব্দের বহুবচন। যার অর্থ অতিরিক্ত। নফল ঐ সম্পদকে বলা হয় যা কাফেরদের সাথে যুদ্ধকালীন সময়ে মুসলিমদের হস্তগত হয়। যাকে গনীমতের মালও বলা হয়। আর একে নফল এই জন্য বলা হয় যে, এই মাল ঐ সকল বস্তুর মধ্যে গণ্য যা পূর্বের জাতির জন্য হারাম ছিল, এভাবে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য এটি একটি অতিরিক্ত হালাল। অথবা এই মালকে নফল এই জন্য বলা হয় যে, জিহাদের যে প্রতিদান তা পরকালে দেওয়া হবে। তার উপর এই মাল একটি অতিরিক্ত জিনিস, যা কখনো কখনো পৃথিবীতেই পাওয়া যায়। কুফর ও ইসলামের প্রথম সংঘর্ষ বদর যুদ্ধে যখন মুসলিমদের বিজয় সূচিত হয়ে গেল এবং কিছু গনীমতের মাল-সামান হাতে এল, তখন সেগুলোর বিলি-বন্টন নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ হয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩২২]

তিনটি বিষয়ে আমল না করা পর্যন্ত ঈমান পূর্ণাঙ্গ নয়। এখান থেকে তাকওয়া, পরস্পর সদ্ভাব রাখা এবং রসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য করার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়।

কুরআনুল কারীমে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ সম্পর্কে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে- (১) আনফাল (২) গনীমত এবং (৩) ফায়।

أنفالশব্দটি তো এ আয়াতেই রয়েছে। আর) غنيمةগনীমত) শব্দ এবং তার বিশ্লেষণ এ সূরার একচল্লিশতম আয়াতে আসবে। আর فيئএবং তার ব্যাখ্যা সূরা হাশরের আয়াত (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُপ্রসঙ্গে করা হয়েছে। এ তিনটি শব্দের অর্থ যৎসামান্য পার্থক্যসহ বিভিন্ন রকম। সামান্য ও সাধারণ পার্থক্যের কারণে অনেক সময় একটি শব্দকে অন্যটির জায়গায় শুধু ‘গনীমতের মাল’ অর্থেও ব্যবহার করা হয় ..

২। এই আয়াতে ঈমানদারদের ৬টি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছেঃ

(ক) তারা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্য করে; কেবল আল্লাহর অর্থাৎ, কুরআনের আনুগত্য নয়।

(খ) আল্লাহর স্মরণের সময় আল্লাহর মহত্ত্বে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে।

(গ) কুরআন পাঠ করলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। (যার দ্বারা বুঝা যায়, ঈমান কম-বেশি হয়; যেমন মুহাদ্দিসগণের অভিমত।)

(ঘ) তারা নিজ প্রভু (আল্লাহর) উপর ভরসা করে। ভরসা করার অর্থঃ যথাসাধ্য বাহ্যিক সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার পর আল্লাহর উপর ভরসা করা।

ঙ। যারা সালাত কায়েম করে এবং

চ। আমরা তাদেরকে যা রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে;

তারাই প্রকৃত মুমিন তাদের রব- এর কাছে তাদেরই জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদাসমূহ, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

৩। আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দু দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে; অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি(বানিজ্য কাফেলার মুকাবিলা) তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক। আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফেরদেরকে নির্মূল করেন।

কারন আল্লাহ চান সত্যকে সত্য ও বাতিলকে বাতিল প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীরা এটা পছন্দ করে না।

৪। নবী (সাঃ) নিজে অন্য এক তাঁবুতে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর নিকট দু’আ করছিলেন। (বুখারীঃ যুদ্ধ অধ্যায়) সুতরাং মহান আল্লাহ দু’আ কবূল করলেন এবং এক হাজার ফিরিশতা একের পর এক মুসলিমদের সাহায্যে পৃথিবীতে নেমে এলেন। (এটি হল প্রথম পুরস্কার।)

৫। ফিরিশতাদের অবতরণ কেবলমাত্র সুসংবাদ ও তোমাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যও ছিল। তাছাড়া সত্যিকারে সাহায্য ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে।ফিরিশতারাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং কিছু কাফেরদেরকে হত্যাও করেছিলেন। (দেখুনঃ বুখারী, মুসলিম যুদ্ধ অধ্যায়)

Sisters’Forum In Islam.com

সুরা আনফাল ২য় রুকু (১১-১৯) আয়াত

১। দ্বিতীয় পুরস্কার হল, উহুদ যুদ্ধের মত বদরের যুদ্ধেও মহান আল্লাহ মুসলিমদের উপর তন্দ্রা আচ্ছন্ন করেন। যার ফলে তাঁদের হৃদয়-ভার অনেকটা হাল্কা হয়ে যায় এবং দেহ-মনে প্রশান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসে।
২। তৃতীয় পুরস্কার তাঁদেরকে এই দান করলেন যে, তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। যার ফলে প্রথমতঃ বালুময় মাটিতে চলাফেরা সহজ হল। দ্বিতীয়তঃ ওযূ ও গোসল করা সহজ হল। তৃতীয়তঃ শয়তান মু'মিনদের অন্তরে যে কুমন্ত্রণা দিচ্ছিল যে, (১) তোমরা আল্লাহর নেক বান্দা হওয়া সত্ত্বেও পানি হতে এত দূরে অবস্থান করছ। (২) অপবিত্র অবস্থায় যুদ্ধ করলে তোমরা কিভাবে আল্লাহর দয়া ও সাহায্য পেতে পারবে? (৩) তোমরা পিপাসিত অথচ তোমাদের শত্রুরা পিপাসিত নয় ইত্যাদি ইত্যাদি-- তা দূর হয়ে গেল
৩। চতুর্থ পুরস্কারঃ অন্তর ও পা দৃঢ়ীকরণ
৪। আরেকটি নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যা বদরের সমরাঙ্গনে মুসলিমদেরকে দেয়া হয়েছে। তা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব ফিরিশতাকে মুসলিমদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন তাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, তোমরা ঈমানদারদিগকে সাহস যোগাতে। এভাবে ফিরিশতাদেরকে দুটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।
প্রথমতঃ মুসলিমদের সাহস বৃদ্ধি করবে। এ কাজটি ফিরিশতাগণ কর্তৃক মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দলবৃদ্ধি করে কিংবা তাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করার মাধ্যমেও হতে পারে এবং নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলিমদের অন্তরসমূহকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করেও হতে পারে। তাদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, ফিরিশতাগণ নিজেরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এবং কাফেরদের উপর আক্রমণও করবেন
৫।কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।
৬।কাফেরদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি।
৭। মুসলিম ও কাফের যখন এক অপরের সম্মুখীন হবে, তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার অনুমতি নেই। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, اجتنبوا السبع الموبقات সাতটি ধ্বংসকারী পাপ হতে বাঁচ, এই সাতটির মধ্যে একটি হল التولى يوم الزحف শত্রু সম্মুখীন অবস্থায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা (পলায়ন করা)। (বুখারীঃ কিতাবুল অসা-ইয়া, মুসলিমঃ ঈমান অধ্যায়)
৮। আয়াতে যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে নিষেধ করা হয়েছে তা হতে দুটি অবস্থা ব্যতিক্রম। প্রথমতঃ যুদ্ধ-কৌশল অবলম্বন। দ্বিতীয়তঃ স্বীয় বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে স্থান নেওয়া। প্রথমটির অর্থ এক দিকে সরে যাওয়া; অর্থাৎ, যুদ্ধ-কৌশল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বা শত্রুদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য যুদ্ধরত অবস্থায় পিছু হটা।
কোন মুজাহিদ যুদ্ধ করতে করতে একা হয়ে পড়ে, তাহলে রণ-কৌশল হিসাবে যুদ্ধ ময়দান হতে সরে পড়া এবং নিজ বাহিনীর নিকট আশ্রয় নেওয়া এবং তাদের সাহায্যে পুনর্বার আক্রমণ করা। এই দুই অবস্থাই বৈধ।
৯। তুমি এটা না ভাব যে, কাফেরদেরকে হত্যা করা তোমার কৃতিত্ব। না, বরং তা আল্লাহর সাহায্যের ফল। যার ফলে তুমি এই শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছ। সত্যিকার তাদের হত্যাকারী মহান আল্লাহই। বদর যুদ্ধে নবী (সাঃ) এক মুঠি বালি নিয়ে কাফেরদের দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন; যা প্রথমতঃ মহান আল্লাহ তাদের মুখ ও চোখ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এর মধ্যে এমন প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফলে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায় ও তারা কিছুই দেখতে পায় না। এই মু'জিযা যা আল্লাহর তরফ থেকে সেই সময় প্রকাশ পায়, তা মুসলিমদের বিজয়ে বিরাট সহযোগিতা করে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! ধুলোবালি তুমি অবশ্যই তাদের দিকে নিক্ষেপ করেছিলে। কিন্তু ওর মধ্যে প্রভাব আমিই সৃষ্টি করেছিলাম, আমি প্রভাব সৃষ্টি না করলে এই ধুলো-বালি কি করতে পারত? এতএব এ কাজ সত্যিকারে আমার, নাকি তোমার?'
১০। আল্লাহ্ কাফেরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন।
১১। আবূ জাহল প্রভৃতি মক্কার কুরাইশ নেতারা মক্কা হতে বের হবার সময় দু'আ করেছিল যে, 'হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যারা তোমার বেশি অবাধ্য ও সম্পর্ক ছিন্নকারী, কাল তাদেরকে ধ্বংস করে দিও।' তারা মুসলিমদেরকে সম্পর্ক ছিন্নকারী ও অবাধ্য মনে করত, সেই জন্য তারা উক্ত দু'আ করেছিল। এবার যখন মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে বিজয় দান করলেন, তখন তিনি তাদেরকে বলছেন যে, তোমরা তো সত্যের বিজয়ই চাচ্ছিলে।

Sisters'Forum In Islam.com

সুরা আনফাল ৩য় রুকু (২০-২৮) আয়াত

১। আনুগত্যের উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকার জন্য মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর।" এবং তাতে স্থির থাক। কারণ, তোমরা আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ, অসীয়ত, নসীহত সবই শুনতে পাচ্ছ। সুতরাং কুরআন ও সত্যবাণী শুনে নেবার পরেও তোমরা আনুগত্য-বিমুখ হয়ো না।

২। শোনার পরও আমল না করা, এটি কাফেরদের অভ্যাস। এই শ্রেণীর অভ্যাস থেকে তোমরা বিরত থাক।

৩। আল্লাহর নিকট সে সমস্ত লোকই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও চতুষ্পদ জীবতুল্য যারা সত্য ও ন্যায়ের শ্রবণের ব্যাপারে বধির এবং তা গ্রহণ করার ব্যাপারে মুক। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে হক জানা ও সে পথে চলার জন্য চোখ ও কান দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সেটা না করে সেগুলোকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করেছে।

৪। তাদের শোনাকে ফলপ্রসূ করে আল্লাহ তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করতেন, যাতে তারা সত্য গ্রহণ করে নিত। কিন্তু যেহেতু তাদের মধ্যে কল্যাণ অর্থাৎ, সত্যের সন্ধানই নেই, সেহেতু তারা সঠিক বুঝ হতে বঞ্চিত।

৫। কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা মানো, তার উপর আমল কর। এতেই রয়েছে তোমাদের জীবন।আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন। এ বাক্যটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে।

(এক) একটি অর্থ হতে পারে যে, যখনই কোন সৎকাজ করার কিংবা পাপ থেকে বিরত থাকার সুযোগ আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা করে ফেল; এতটুকু বিলম্ব করো না এবং অবকাশকে গনীমত জ্ঞান কর।

(দুই) হতে পারে যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দার অতি সন্নিকটে তাই বলে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি মানুষ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যখনই তিনি কোন বান্দাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে চান, তখন তিনি তার অন্তর ও পাপের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেন। আবার যখন কারো ভাগ্যে অমঙ্গল থাকে, তখন তার অন্তর ও সৎকর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়া হয়।

(তিন) ইবনে অববাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর অর্থ আল্লাহ কাফেরের ঈমান ও মুমিনের কুফরীর মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। [মুসানদে আহমাদ ৩/১১২ [ইবন কাসীর]

(চার) কেউ কেউ বলেনঃ আয়াতটি যেহেতু বদর যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট সেহেতু তার অর্থ হবে- জেনে রাখ, আল্লাহ তার নেক বান্দাদের ভাগ্যকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করেন। আর কাফেরদের প্রশান্ত অন্তরে অশান্তি ও ভয়ে পরিবর্তন করে দেবেন। আবার তিনি ইচ্ছে করলে মুসলিমদের নিরাপদ অবস্থাকে ভীত অবস্থায় রুপান্তরিত করতে পারেন। [ফাতহুল কাদীর]

৬। আয়াতে কিছু পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, পাপের আযাব শুধু পাপীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পাপ করেনি এমন লোকও তাতে জড়িয়ে পড়ে।

৭। আলোচ্য আয়াতে মক্কী জীবনের কষ্ট ও বিপদের বর্ণনা এবং তারপরে মাদানী জীবনে আল্লাহর অনুগ্রহে যে সুখ-শান্তি ও সচ্ছলতা মুসলিমগণ লাভ করেছিলেন তার বর্ণনা রয়েছে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

৮। আল্লাহর আমানত বলতে অধিকাংশের মতে যাবতীয় ফরয কাজ বুঝানো হয়েছে। আর রাসূলের আমানত বলতে তার সুন্নাত ও নির্দেশ বুঝানো হয়েছে। সে হিসাবে খেয়ানত হলো সেগুলো না মানা। [ফাতহুল কাদীর]

৯। সাধারণতঃ সন্তান ও সম্পদ মানুষকে খিয়ানত করতে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হতে বাধ্য করে। সেই জন্য সে দুটিকে ফিতনা (পরীক্ষা) বলা হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা মানুষের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে যে, তাদের ভালবাসায় আমানত ও আনুগত্যের হক পূর্ণরূপে আদায় করে কি না?

Sisters'Forum In Islam.com

সুরা আনফাল ৪র্থ রুকু (২৯-৩৭) আয়াত+ (৩৮-৪০)

১। তাকওয়া' অবলম্বন করতে বলেছেন ইমানদারদের হয়-তাহলে সে এর বিনিময়ে কয়েকটি প্রতিদান লাভ করবে। (এক) ফুরকান, (দুই) পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও (তিন) মাগফেরাত বা পরিত্রাণ। (চার) জান্নাত। [সা'দী; আইসারুত তাফসীর]

২। এটি সেই ষড়যন্ত্রের বর্ণনা যা মক্কার নেতারা এক রাত্রে 'দারুন নাদ্ওয়া'য় বসে করেছিল। বিভিন্ন গোত্রের যুবকদেরকে মহানবী (সাঃ)-কে হত্যার জন্য নিযুক্ত করা হোক।আল্লাহ তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছেন। সুতরাং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে (وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা সবচাইতে উত্তম ব্যবস্থাপক, যা যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে চাপিয়ে যায়। যেমনটি এ ঘটনার সাথে পরিলক্ষিত হয়েছে।

৩। এটা ছিল কাফের কুরাইশদের মুখের কথা আমরা তো শুনলাম, ইচ্ছে করলে আমরাও এর মত করে বলতে পারি, এগুলো তো শুধু পুরোনো দিনের লোকদের উপকথা।। তারা কুরআনের বিপরীতে কিছুই আনতে পারেনি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। এটা বলে তারা নিজেদেরকে ধোঁকায় ফেলছিল এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করছিল।

৪।আবু জাহল এ বলে দোআ করত যে, হে আল্লাহ! এই কুরআনই যদি আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা কোন কঠিন আযাব নাযিল করে দিন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় যে, তাদের মধ্যে আপনার অবস্থান করা অবস্থায় আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না আর আল্লাহ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। [বুখারীঃ ৪৬৪৮]

৫।নবীর বিদ্যমান থাকা অবস্থায় জাতির উপর আযাব আসে না। এই দিক দিয়ে নবী (সাঃ)-এর বিদ্যমানতা তাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ ছিল।
তারা ভবিষ্যতে ইসলাম গ্রহণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। অথবা তাওয়াফ করার সময় মুশরিকরা 'গুফরানাকা রাব্বানা গুফরানাক' (তোমার ক্ষমা চাই প্রভু! তোমার ক্ষমা চাই) বলবে।

৬। মুশরিকরা নিজেদেরকে মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক মনে করত। এই কারণেই তারা যাকে ইচ্ছা তাওয়াফের অনুমতি দিত, আবার যাকে ইচ্ছা তাওয়াফে বাধা দিত। অনুরূপ মুসলিমদেরকেও মসজিদে আসতে বাধা দিত। অথচ আসলে তারা মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক ছিল না। শক্তির জোরে এ রকম মনে করত।এই আয়াতে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ মক্কা বিজয়। যা ছিল মক্কাবাসীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব সমতুল্য।

৭। মুশরিকরা যেমন উলঙ্গ হয়ে কা'বার তাওয়াফ করত অনুরূপ তাওয়াফের সময় মুখে আঙ্গুল দিয়ে শিস দিত ও দুই হাত দিয়ে তালি বাজাতো, তাদের জন্য আযাব বলতে এখানে দুনিয়ার আযাবও হতে পারে যা বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের মাধ্যমে তাদের উপর নাযিল হয়।

৮। মহান আল্লাহ এই আয়াতে তাদের বা তাদের মত চরিত্রের অধিকারী লোকেদের(আবূ সুফিয়ান ও যারা বাণিজ্যের শরীকান ছিল তাদের নিকট গিয়ে আপিল করল যে, এই কাফেলার সকল সম্পদ মুসলিমদের নিকট থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ব্যয় হোক।) ব্যাপারে বলেন, নিঃসন্দেহে কাফেররা অন্যদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বাধা দানের জন্য সম্পদ খরচ করবে। ফলে তাদের ভাগ্যে আফসোস ও দুঃখ ছাড়া আর কিছু থাকবে না। আর পরকালে তাদের স্থান হবে জাহান্নাম।

৯। সৎলোকদেরকে অসৎ লোক হতে আলাদা করে নেওয়া হবে। সৎলোকদের হতে আলাদা হয়ে যাবে অপরাধীরা অর্থাৎ, কাফের-মুশরিক ও অবাধ্য লোকেরা। এদেরকে একত্রিত করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। অথবা এই পৃথকীকরণ পৃথিবীতেই ঘটবে।

Sisters'Forum In Islam.com

সুরা আনফাল ৫ম রুকুর (৩৮-৪০)

১। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহেলিয়াতে (অর্থাৎ কাফের অবস্থায়) যা করেছি, তার জন্য কি জবাবদিহি করতে হবে? তিনি বললেনঃ যদি কেউ ইসলামে সুন্দরভাবে আমল করে তবে জাহেলিয়াতের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি করতে হবে না। আর যদি খারাপ আমল করে তবে পূর্বাপর সবকিছুর জন্যই ধরা হবে। [বুখারীঃ ৬৯২১]

২। 'ফিতনা' শিরককে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, ঐ সময় পর্যন্ত জিহাদ চালু রাখো, যতক্ষণ শিরক নিঃশেষ না হয়ে যায়।মুসলিমদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে যতক্ষণ না শির্ক ও কুফর নিঃশেষিত হয়ে যায়। [তাবারী; ইবন কাসীর] এক্ষেত্রে এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হবে কিয়ামত পর্যন্ত শর্ত সাপেক্ষে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না দুনিয়া থেকে শির্ক ও কুফর নিঃশেষিত না হবে বা শির্কের প্রভাব কমে না যাবে।

৩। আর যদি তারা মুখ ফিরায় তবে জেনে রাখ, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক, তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

Sisters'Forum In Islam.com

আলহামদুলিল্লাহ্!

৯ম পারা সমাপ্ত

৬ষ্ঠ তারাবীহ সমাপ্ত

Sisters'Forum In Islam.com